ভুল ধরার ফল

– আবদুর রহিম

আমার দুই বছর বয়স থেকে বাবা সপরিবারে তার ব্যবসায়িক কর্মস্থল সংযুক্ত আরব আমিরাতের আল–আইন শহরে থাকতেন। আমার বোঝার বয়স থেকে মা–ই ছিলেন আমার প্রথম গৃহশিক্ষক। আমার ক্লাস এইট পাস মা আমাকে লেখাপড়ায় হাতেখড়ি দিতে সব সময় ব্যস্ত থাকতেন। ইংরেজিতে কাচা থাকায় ঠিক করলেন একজন গৃহশিক্ষক নিয়োগ দেবেন।

আব্বুর পরিচিত একজনের মাধ্যমে অবশেষে একজন বাঙালি আমাকে পড়াতে রাজি হলেন। তার নাম ছিল মোহাম্মদ উল্লাহ চৌধুরী। খুব ভালো মনের ও মানের মানুষটি আমাকে ইংরেজি ভাষা শেখাচ্ছিলেন।

চৌধুরী স্যার টিউশনি করার ফাকে ফাকে আরো অনেক কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িত রাখতেন। তারই প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অতি অল্প বয়সে একটি ইনডিয়ান স্কুলে ভর্তি হতে পেরেছিলাম। হঠাৎ কুয়েত–ইরাক যুদ্ধের ডামাডোলে বাবা অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে সপরিবারে দেশে ফিরে যাই। প্রায় আট মাস থাকার পর পুনরায় আবার আমাদের নিয়ে আসেন।

আগের মতো চৌধুরী স্যার আমাকে বাসায় পড়াতে শুরু করলেন। আট মাস দেশে থেকে আমার পড়াশোনায় যে ক্ষতি হয়েছিল তা পুষিয়ে নেয়ার জন্য বাবা মাকে বলে নতুন স্থাপিত *বাংলাদেশ ইসলামিক স্কুল*–এ ভর্তি করে দেন।

আমি ক্লাস ফোরে এবং মেজ ও ছোট ভাই যথাক্রমে ক্লাস টু ও ক্লাস ওয়ানে।

পড়াশোনা চালু ছিল। আমার ক্লাস টিচার ছিলেন বাঙালি এক মহিলা যার নাম ছিল নূরজাহান বেগম। আমার ক্লাসে তখন মাত্র তিনজন ছাত্রছাত্রী। একজন আমি ও দ্বিতীয়জন আমাদের প্রতিবেশী ফ্ল্যাটের চট্টগ্রামবাসী ইউসুফ ও একটি মেয়ে। তিনজনের মধ্যে আমার আইকিউ ভালো ছিল। কিন্তু কম ছাত্রছাত্রীর ক্লাসে আমার মন বসছিল না।

আমাদের ক্লাস–টিচার বাংলা ও ইংরেজি পড়াতেন। বাংলা ঠিকঠাক পড়ালেও তার ইংরেজি পড়ানো আমার কাছে বিশ্রী কিসিমের খারাপ লাগতো। তাই মাঝে মধ্যে একটু–আধটু ভুল ধরে ফেলতাম যা ছোট্ট বয়সের কোনো খেলার চেয়ে কম মনে হতো না। কিন্তু তখন পর্যন্ত আমার জানা ছিল না এই ভুল ধরা আমার জন্য কাল হয়ে দাড়াবে।

চৌধুরী স্যার স্কুলটির সাধারণ সম্পাদকও ছিলেন। আমার স্কুলে ভর্তি হওয়ার প্রায় সাড়ে চার মাস হতে চলছিল।

হঠাৎ কথা উঠলো স্কুলের টিউশন ফি নিয়ে। শত কষ্ট হোক বাবা সব সময় চাইতেন যে আমরা আমাদের নিজস্ব জগৎ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর কোনো প্রকার খবরাখবর যেন না রাখি অর্থাৎ খাতা, পেন্সিল টেনশন থেকে আমার স্কুল ফিস দেয়া হলো কি না তা জানাও আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

দুই সপ্তাহ না যেতেই একটি লিস্ট নিয়ে ক্লাস–টিচার হাজির। আমাকেসহ স্কুল থেকে আরো দশ পনেরোজনকে টিচার্স কমনরুমে ডেকে নিলেন। ওই লিস্ট ছিল বেতন খেলাপিদের। এবার সবচেয়ে নির্দয় অধ্যায়। তিনি সকলকে নিয়ে স্কুল প্রাঙ্গণের ছোট মাঠটিতে প্রখর রোদের মাঝে দাড় করিয়ে রাখলেন।

উল্লেখ্য, চৌধুরী স্যার কয়েকদিন সর্দি–জ্বরে আক্রান্ত হয়ে স্কুলে আসতে পারছিলেন না।

খেলাধুলার সময় ছাড়া সেদিনের রোদের তাপমাত্রা অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি তেজোদীপ্ত মনে হচ্ছিল।

আমার ছোট দুভাই কিছু না বুঝে হঠাৎ কান্না জুড়ে দিল।

নূরজাহান বেগম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কি বুঝে ছোট ভাইদের যেতে দিলেন। আমাকে যেতে দিলেন না এবং অত্যন্ত শ্লেষ মাখা সুরে বলতে লাগলেন, অনেক বেয়াদবি সহ্য করেছি। এই বলে লাল চোখে আমার দিকে দেখছিলেন।

ক্লাসে এমনিতে অল্প পড়া না পারলেও তিনি বেত তুলতেন। প্রায় আধা ঘণ্টা রোদে দাড়িয়েছিলাম। ছুটি হলে বাসায় এলাম। অপমান বোধ কোন ধরনের বোধ তা ওইদিন বুঝতে পেরেছিলাম।

দুপুরে বাবা বাসায় এলে ছোট দুভাই কাদতে কাদতে বাবাকে সব বলে দিল।

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, চৌধুরী স্যার স্কুলে ছিলেন কি না।

জবাব পেলে কিছু না বলে দুপুরের খাবার না খেয়েই ফের বেরিয়ে গেলেন।

পরে শুনেছি বিকেলে স্যারের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। স্কুলটি নতুন বলে শিক্ষা বিভাগ তখনকার মতো স্কুলটির অগ্রগতি হিসাব করার জন্য সাময়িকভাবে ছাত্রছাত্রী নিয়ে কাজ শুরু করেছিল। তখনো বেতন নির্ধারণ হয়নি। নুরজাহান বেগম আসলে হেড মাস্টারের অনুপস্থিতিতে অ্যাসিস্টান্ট হেডমাস্টার পদে বসে ওই হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এতে চৌধুরী স্যারের কোনো হাত ছিল না কিংবা তিনি ওই দিনের ঘটনা সম্পর্কেও কিছু জানেন না। ফলাফল পরদিন থেকে স্কুলে যাওয়া বন্ধ।

শিক্ষিকাদের ওপর বিদ্বেষ বেড়ে গিয়েছিল। তা এতো বেশি ছিল, বাবাকে বলে দিয়েছিলাম যে স্কুলে মহিলা শিক্ষিকা থাকবে সে স্কুলে পড়বো না।

কিন্তু তা ছিল অসম্ভব। কিন্ডারগার্টেন পর্যায়ে যে কোনো স্কুলেই ছাত্রছাত্রীদের জন্য মহিলা শিক্ষকই রাখতে হয়। শিশুদের সঠিক মানসিক উন্মেষ ঘটানোর জন্য এ দেশের শিক্ষা বিভাগই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

বছর ঘুরে নতুনভাবে ভর্তি হলাম একটি ইনডিয়ান স্কুলে।

পরে ১৯৯৫-তে বাড়িতে অর্থাৎ বাংলাদেশে চলে গেলাম। পেছনে রয়ে গেল ইনডিয়ান স্কুলের মধুময় স্মৃতিগুলো যেখানে শিক্ষক, ছাত্র সম্পর্ক বিদ্বেষপূর্ণ নয়।

ঘটনাটি এখানেই শেষ হলে হতে পারতো। কিন্তু কর্মজীবনের এ প্রবাসে হঠাৎ একদিন একটি বাঙালি গ্রসারিতে নুরজাহান বেগমকে দেখলাম। দেখে পুরনো জখম তাজা হলো। সঙ্গে তার স্বামী ছিলেন। আমাকে চেনা তার জন্য দুষ্কর হলেও তাকে এক দেখাতেই চিনেছিলাম।

দোকান থেকে বের হলেই দোকানদারকে তার কথা জিজ্ঞাসা করলে বললেন, বর্তমানে কোনো এক ইনডিয়ান স্কুলে কর্মরত আছেন।

এবার ওই স্কুলের ছাত্রছাত্রীর ওপর কেমন জানি মায়া অনুভব করলাম।

আল-আইন, ইউএই থেকে

rahim7335318@yahoo.com

সংবর্ধনা

- সাদেকা শফিউল্লাহ

১৯৫৪ সালের কথা। আমাদের সবেমাত্র বিয়ে হয়েছে। আমার স্বামী ক্যাপ্টেন মুহাম্মদ শফিউল্লাহ তখন যশোর বিগ্রেডের জি-থ্রি হিসেবে কর্মরত। বিগ্রেড মেসে আমাদের বিয়ে উত্তর সংবর্ধনা দেয়া হচ্ছে।

বিকেল থেকেই মহাব্যস্ততা সবার। ভাবীরা নাকি পাচটা থেকেই সাজতে বসে গেছেন। আমি সাধ্যমতো সাজগোজ করে তৈরি। মিসেস ইয়াসিন (আমাদের ম্যাচমেকার) আমাকে আগেই সাজগোজ সম্পর্কে কিছুটা বৃফিং দিয়ে রেখেছিলেন। আমার স্বামী ঘড়ির কাটা মিলিয়ে আমাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে গেলেন।

মেসের সামনে আসতেই আমার বুকের কাপুনি শুরু হয়ে গেল। এ দেখি এলাহি কাণ্ড। আমরা জিপ থেকে নামতেই ব্যান্ড বেজে উঠলো *হি ইজ এ জলি গুড ফেলো*। বিরাট বিরাট মোচওয়ালা অফিসাররা আমাদের রিসিভ করার জন্য দাড়ানো।

আমি গুটিশুটি মেরে স্বামীর পিছু পিছু আসতেই দেখি ইয়াসিনভাবী এগিয়ে এসেছেন। তিনি আমাকে এসকর্ট করে মেসের হল রুমে নিয়ে এলেন।

আমাকে বেশ বড় একটা রাজকীয় চেয়ারে বসানো হলো। ওখান থেকেই দেখা যাচ্ছিল বাইরের লনে আগুনের লেলিহান শিখায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা ঝুলন্ত খাসি রোস্ট করা হচ্ছে।

ভাবী বললেন, এটা তোমাদের জন্যই।

এরপর আমন্ত্রিত অফিসাররা আমার সঙ্গে পরিচিত হতে এলেন। তারা আমার দুপাশে রাখা চেয়ারে বসে নিজেদের পরিচয় দিয়ে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিন্তু আমি পড়লাম মহা বিপদে। সবেমাত্র এসএসসি পাস করে কলেজে ভর্তি হয়েছি। উর্দুর 'উ' জানি না আবার ইংরেজি বুঝেতে পারলেও বলার মতো সাহস তখনো হয়নি। এদিকে এমন একটা পরিবেশে বোবা হয়ে বসে থাকাটাও শোভনীয় নয়। এতে আমার স্বামীর সম্মান ক্ষুণ্ন হতে পারে। তাই মরিয়া হয়ে বাংলা ইংরেজি মিশ্রিত *খিচুড়ি* ভাষায় উত্তর দিতে লাগলাম। সেই সঙ্গে আমার মুখভঙ্গি ও হাতের ইশারা তো ছিলই। সম্ভবত আমার বাচন ভঙ্গিতেই স্বামী আমার চোখের আড়ালে পালিয়ে বাচলেন। এমন কথাবার্তায় যে সবাই খুব মজা পাচ্ছিলেন এবং তাদের কৌতূহল যে বেড়ে যাচ্ছিল তা বুঝতে পারছিলাম।

কিছুক্ষণ পর একজন গাট্টাগোট্টা ছোটখাটো লোক এক প্লেট কলিজা ভুনা এনে সামনে রাখলেন। বললেন, খান। এটা খেতে হয়। আমি ক্যাপ্টেন মশরুল হক।

ভীষণ একটা স্বস্তি নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি বাঙালি?

তিনি ততোটাই গাম্ভীর্য নিয়ে বললেন, না, আমি সাওতাল।

মনে মনে বেশ অবাক হলাম। দেখতে সাওতাল হলেও নামটা অন্য রকম কেন? তিনি গট গট করে চলে গেলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পর ক্যাপ্টেন দস্তগীর এলেন। বললেন, কেমন লাগছে? কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো?

সাগ্রহে বললাম, আপনি বাঙালি?

তিনি বললেন, নেই হাম বিহারকা রহনেওয়ালা।

আপনি তো ভালো বাংলা বলেন। আমি আবারও বলি।

তিনি বললেন, আমি রবীন্দ্রনাথের কবিতাও আবৃত্তি করতে পারি।

তাই? আমি খুব আগ্রহী হয়ে উঠি।

তিনি গড় গড় করে আবৃত্তি করেন –

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর
কেমনে পশিল গুহার আধারে
প্রভাত পাখির গান ...।

চারদিক থেকে হাততালির শব্দে তিনি থেমে গেলেন।

এরপর বেশ কিছুক্ষণ বিরামহীন *খিচুড়ি* ভাষায় কথা বলার পর ক্যাপ্টেন রব (সিলেটের) এলেন। হাতে একটা বিয়ারের মগ। আমার পাশে এসে বসলেন। রবভাইকে আগেই চিনতাম। বললেন, এটা খাচ্ছি, কিছু মনে করছেন না তো?

কেন, আমি তো খাচ্ছি। আমার হাতের ভিমটোর গ্লাসটা তুলে ধরে ওনাকে দেখালাম। তখনকার দিনে ভিমটো ছাড়া কোনো পেপসি জাতীয় কোমল পানীয় ছিল না, আর আমি বিয়ার কিংবা কোনো মদও চিনতাম না।

তিনি একটু হেসে চেয়ার থেকে উঠে দাড়ালেন এবং আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, So innocent. এতো নিপাপ!

আজ আমার স্বামী নেই, রবভাই নেই, মশরুলভাইও নেই। কিন্তু স্মৃতির ভাণ্ডারে তাদের কথাগুলো উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

এক. বৃগ্রেডিয়ার জেনারেল অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন মশরুল হক

দুই. মেজর জেনারেল দস্তগীর অবসরপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত।

তিন. কর্নেল রব অবসরের আগেই মৃত্যুবরণ করেন।

গৃন রোড, ঢাকা থেকে

গ্লানি

– আফনান

আমার ভাই সুজন। খুলনা থেকে ছুটিতে এলে শুধু ওর মেডিকাল কলেজেরই গল্প শোনায়। ওর রকমারি গল্পের ঝুলিতে হাসপাতালের রোগীদের দুঃখ–কষ্টের গল্পই বেশি থাকে।

সরকারি হাসপাতালের নামমাত্র মূল্যের চিকিৎসা নিতে যারা আসে তাদের বেশির ভাগই অতি নিম্নবিত্ত, যাদের পক্ষে ওই নামমাত্র মূল্যটারও যোগান দেয়া সম্ভব হয় না। এসব রোগীর খোজখবর নেয়া দূরে থাক, রিলিজ নিতেও কেউ আসে না।

এদেরই মতো চোদ্দ পনেরো বছরের ছেলে আজাদ। নিয়মিতই হাসপাতালে ভর্তি হতো। অতি গরিব মায়ের একমাত্র ছেলে। পেটে কি জানি হয়েছে, পানি জমে ফুলে থাকতো। তখন সে চিৎকার করে – *ও ডাক্তার, আমার পানি বাইর করি দাও। আমি আর বাচুম না রে, বাচুম না।*

ধমক না দিলে সে চিৎকার থামাতো না। প্রাথমিক চিকিৎসার পর অবজারভেশন–এ রাখতে গিয়ে দেখা যেতো প্রায়ই সে না–ই হয়ে গেছে। পরে ফিরলে সুজনরা জিজ্ঞাসা করে কোথায় ছিলি?

সে লাজুক হাসতো। ধমকালে মিনমিনে স্বরে স্বীকার করতো, ভিক্ষা করতে।

চিকিৎসা খরচ যোগাতে সে এ কাজে যেতো। কিন্তু খুব লজ্জা পেতো এ জন্য।

সুজনরা জানতো পেটে একটা অপারেশন না হলে আজাদকে বাচানো যাবে না। কিন্তু টাকার জন্য তা সম্ভব হচ্ছিল না। কিছুদিন পর পরই সে ভর্তি হয়ে বলতো, ভাইয়া আবার আসছি।

এক পর্যায়ে অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেলে অনেকে মিলে প্রাথমিক খরচের টাকা জোগাড় করে ওর অপারেশনটা করিয়ে দেয়। এ অপারেশনেরই পরবর্তী চিকিৎসার টাকা জোগাড় করতে গিয়ে আজাদ কঠিন পৃথিবীর ভয়ঙ্কর রূপের সম্মুখীন হয়।

অপারেশনের কয়দিন পরই সে কিভাবে জানি আবার পালিয়ে যায়। একটু তাড়াতাড়ি টাকা জোগাড়ের মতলবে বিপথে পা বাড়ায়।

প্রায় অজ্ঞান দশায় রক্তমাখা আজাদকে পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে আসে। পুলিশই জানায়, সে একটা বাড়িতে পানির মোটর চুরি করতে গিয়ে বাড়ির মহিলাদের হাতেই ধরা পড়ে এবং পিটুনি খায়। সমস্ত গৃহিণীদের বাঘা লাথি পেটে পড়ে সেলাই খুলে তার এ দশা।

পরে আজাদ মারা যায়। তবে ওই পিটুনি খেয়ে নয়। সুজন বলে, চুরির অপমান সইতে না পেরে সে নাকি আত্মহত্যা করেছিল। ক্লাস ফাইভ কি ক্লাস সিক্স পর্যন্ত ওর লেখাপড়া।

জিজ্ঞাসা করলো বলতো, *পাচ কেলাস পাস দিছি, ছয় কেলাসে পড়মু।*

ওইটুকু শিক্ষাই হয়তো ওর মাঝে এই বিপুল আত্মমর্যাদা বোধ সৃষ্টি করেছে। ফলে সে ওইটুকু চুরির চেষ্টার দায়ের অপরিসীম গ্লানি মাথায় নিয়ে অসীমের পথে যাত্রা করে।

মনিপুরীপাড়া, ঢাকা থেকে

নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গী

– এস আর গালিব

নাম তার শেখ আহাম্মদ। হঠাৎ একদিন একটি ঝোলা নিয়ে তিনি আমার বাসার সামনে এসে দাড়ালেন। ১৯৭৫ সালের কথা।

আমি যেখানে থাকি সেখানে একটি ফিল্ড সুপারিনটেনডেন্টের কোয়ার্টার। একটি ফিল্ড অফিসার কোয়ার্টার এবং একটি গার্ড কোয়াটার নিয়ে আমাদের বসবাস। জায়গাটির দূরত্ব থানা হেড কোয়ার্টার থেকে প্রায় ছয় সাত কিলোমিটার।

সরকারি বাসা রয়েছে। কিন্তু লোক নেই। পাহাড়ি নির্জন দুর্গম এলাকা। যোগাযোগ ব্যবস্থা অপ্রতুল। এছাড়া রয়েছে শান্তি বাহিনীর উপদ্রব। তাই কেউ এখানে পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করেন না। এক কথায় সবাই ব্যাচেলর।

একজন সিনিয়র কর্মকর্তা, তিন জুনিয়র কর্মকর্তা ও তিন চারজন গার্ড নিয়ে আমাদের ফিল্ড টিম। বাসার সামনে পাহাড়ের নিচেই পাহাড়ি ছড়া। পানি অত্যন্ত স্বচ্ছ, কিন্তু পানির গভীরতা মাত্র দুই আড়াই ফিট। সেই পানিতে খালি পায়ে দাড়ালে প্রাণ ছুয়ে যায়।

আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে বললাম, কি চাই?

সে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় বললো, এক গ্লাস পানি খাওয়াবেন। বলে আমার বাসার বারান্দায় ধপ করে বসে পড়লো অর্থাৎ সে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত।

হাড় জিরজিরে শরীর। উচ্চতা পাচ ফিট চার ইঞ্চির বেশি নয়। চোখগুলো কোটরাগত। মাথার চুল খুব ছোট করে ছাটা যা কাচা–পাকায় মিশ্রিত। দেখে মনে হয় কদম ফুল ফুটে আছে। পরনে একটি অত্যন্ত কম দামি পুরনো ছেড়া লুঙ্গি, গায়ে হাফ ফতুয়া। বয়স অনুমান করা মুশকিল। পয়ষট্টি হতে পারে আবার পচাত্তরও হতে পারে।

তাকে অত্যন্ত গরিব ও দুঃখী মানুষ বলে আমার মনে হলো। বাসার ভেতর থেকে দুটি বেলা বিস্কিট ও এক গ্লাস পানি নিয়ে তার সামনে ধরলাম।

এক নিঃশ্বাসে সব টুকু পানি পান করে আবার পানি চাইলো এবং বিস্কিট দুটি খেতে আরম্ভ করলো।

এবার আমার প্রশ্নের পালা। কোথায় যাবেন? তিনি বললেন, ঠিক নেই, *যেখানেই রাত সেখানেই কাত।* এই কথাগুলো বলে তিনি এবার আমাকে প্রশ্ন করলেন, এখানে কি আপনি একা থাকেন?

বললাম, না। আমার মতো আরো পাচ ছয়জন থাকেন। আমরা সবাই বাসাপ্রতি দুই তিনজন করে থাকি। তবে আমাদের বাসার রুম সংখ্যা বেশি বলে অধিকাংশ রুম এমনিতেই খালি পড়ে থাকে।

আমি চেয়ারে বসে আছি এবং তিনি বারান্দার মেঝেতে। দুপুর এক দেড়টা হবে। প্রায় আধা ঘণ্টা হলো তিনি এসেছেন। কিন্তু যাওয়ার নামগন্ধ নেই। তাই মনে মনে বিরক্ত হচ্ছি।

আমাদের এখানে প্রায় সবাই উড়নচণ্ডি অর্থাৎ সকালে পেট পুরে খেয়ে ডিউটিতে বের হলে রাত আটটা নয়টার আগে কেউ বাসায় ফেরে না। আমিই একমাত্র এর ব্যতিক্রম। আমি আবার আড্ডা ও অযথা ঘোরাঘুরি একদম পছন্দ করি না। আধাবেলা ফিল্ড ডিউটি ও আধাবেলা অফিস ডিউটি করে তারপর হাটবাজারে আড্ডা দিয়ে তবেই বাসায় ফেরা অর্থাৎ এই জংলি পরিবেশে কে থাকতে চায়?

চাকরির বাজার মন্দা বলে বাধ্য হয়ে এই পরিবেশে থাকা। এখানে শহরের কোনো কোলাহল নেই, নেই কোনো যন্ত্র দানবের ঘ–র–র ঘ–র–র শব্দ। একেবারেই প্রাগঐতিহাসিক পরিবেশ। বেশিদিন থাকলে এমনিতেই মন হাপিয়ে ওঠে। মানুষজন নেই বলে সারা দিন কথা বলার তেমন লোক পাওয়া যায় না। তাই মন মরা অবস্থায় থাকতে হয়।

দুপুরের খাবার সময় হয়েছে। ফিল্ড ডিউটি থেকে এসেছি। শরীর পরিশ্রান্ত। এখন গোসলের সময়। তারপর খাওয়া–দাওয়া সেরে বিশ্রাম। ফলে নিতান্তই বাধ্য হয়ে তাকে বললাম, এবার যান, আমার কাজ আছে।

তিনি লাজুক চোখে আমার দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে বললেন, সাব আমাকে একটু থাকার জায়গা দেবেন?

বললাম, তা কি করে হয়। তাছাড়া তোমাকে চিনি না, জানি না বা কি পরিচয়।

হঠাৎ ইমোশনাল হয়ে তাকে জায়গা দিয়ে কোনো বিপদে না পড়তে হয়?

আমার কথা শুনে তিনি মনে হয় মনঃক্ষুণ্ন হলেন। বললেন, আমি আশ্রয়হীন মানুষ। তাই দুই চার দিনের জন্য একটু থাকার জায়গা চাই।

তার এই কথাগুলো শুনে মনে দয়ার উদ্রেক হলো। কিন্তু সবার সম্মতি ছাড়া তাকে আশ্রয় দিই কি ভাবে? যেহেতু বস নেই।

আমাদের এলাকা থেকে লোকালয় প্রায় এক কিলোমিটার পশ্চিমে। পূর্ব, উত্তর, দক্ষিণে পাহাড় আর পাহাড়। হয়তো বন অথবা রাবারের বাগান, তারপর আদিবাসী বসতি। সারা দিন কিছু রাখাল ছেলেমেয়ে ছাড়া আর পাহাড়গামী কিছু লোক ছাড়া কারো দেখা সাক্ষাৎ মেলে না।

শেষে অনেক চিন্তাভাবনা করে ফিল্ড সুপারের বাসার একটি খালি রুমে তার থাকার জায়গা করে দিলাম। তার সম্বল বলতে একটি ছেড়া পুরনো মশারি, একটি শত ছিন্ন ছেড়া কাথা, দুইটি ছোট অ্যালুমিনিয়ামের হাড়ি, একটি থালা ও একটি প্লাস্টিকের গ্লাস। দুপুরে আমার এখানেই খেতে বললাম এবং আসরের নামাজের পর তাকে আমার সঙ্গে করতে বলে তাকে বিদায় দিলাম।

সন্ধ্যের আগে তাকে নিয়ে বসলাম।

তিনি বললেন, তার আসল বাড়ি চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই থানার এক প্রত্যন্ত গ্রামে। যৌবনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও পরে বহুদিন মিয়ানমারে ছিলেন। বিয়ে–শাদি করেননি। বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় তার বসবাস। গ্রামের বাড়িতে তার ভাইবোনেরা রয়েছেন। তারা কেউ তার খোজখবর নেন না।

দুই দিন আগে তিনি রাউজান এসেছিলেন এবং সেখানে কোনো কাজ না পেয়ে লোক মুখে খবর পান আমাদের এই এলাকায় প্রচুর ছন পাওয়া যায়, যা কেটে বিক্রি করে স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করতে পারবেন। তাই এখানে তার আগমন।

এরইমধ্যে আমাদের বস ও সহকর্মীরা বাসায় এসেছেন। সবার কাছে তার কথা বলাতে এই আশ্রয়হীন লোককে কেউ আর বিব্রত করতে চাইলেন না। বরং সবাই মনে করলেন আমাদের বাসাগুলো পাহারা দেয়ার জন্য একজন লোক তো পাওয়া গেল।

এক দিন, দুদিন, তিন দিন। শেখ আহাম্মদ প্রতিদিন ছন কাটেন, রৌদ্রে শুকান তারপর হাটবারে রাউজান ফকিরহাটে গিয়ে বিক্রি করে বিক্রির টাকা অর্থ দিয়ে সওদাপাতি কিনে আনেন।

শেখ আহাম্মদ আসাতে হাপ ছেড়ে বাচলাম।

শীতের শেষে বসন্তকাল চলে এলো। প্রতিদিন দেখি তিনি অত্যন্ত কষ্ট করে পাহাড়ি দুর্গম এলাকা থেকে ছন কেটে আনেন, যা তার এই বয়সে মানায় না। কিন্তু বাস্তব তো সে কথা মানে না। কারণ বেচে থাকতে হলে পরিশ্রম করে খেতে হবে।

বসন্ত ও গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হলে পাহাড়ে পাহাড়ে শুরু হয় আগুনের তাণ্ডব। কিছু কিছু অবিবেচক লোক এ সময় পাহাড়ে আগুন লাগায়। এরই কারণে সরকারি বনভূমি ও রাবার বাগানের রাবারগাছ পুড়ে কোটি কোটি

টাকার ক্ষতি হয়। তাই এই সময় সরকারি বনভূমি ও রাবার বাগানের রাবার গাছকে আগুনের সমূহ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য অগ্নি প্রতিরোধ লাইন তৈরিসহ সিজনাল শক্ত পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ এই সিজনে ক্যাজুয়াল শ্রমিক নিয়োগ করে বাগান পাহারার ব্যবস্থা করা হয়।

আমরা শেখ আহাম্মদকে চাচা বলে ডাকতাম। তার দুরবস্থা দেখে তাকে একটি সিজনাল চাকরি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। এটা একটা স্বায়ত্বশাসিত সরকারি প্রতিষ্ঠান। তাই ওই পদে যোগ্য ও সুস্বাস্থ্যধারী লোকদেরই নিয়োগ দেয়া হয়। সে যোগ্যতার আলোকে শেখ আহাম্মদ একেবারেই বেমানান। ইতিমধ্যেই তার পিঠে বাক ধরেছে। এমনকি সোজা হয়ে দাড়াতে পারেন না। তাই এ লোককে নিয়োগ দেয়ার ব্যাপারে নিয়োগ কমিটির অনেক সদস্য আপত্তি তুললেন।

আমরাই আবার নিয়োগ কমিটির দুই সদস্য। তাই কর্তৃপক্ষের শত বাধার মুখে আমরা এক রকম জোর করেই তার নিয়োগ সম্মতি আদায় করলাম।

রাত্রিতে সবাই বাসায় ফিরে শেখ আহাম্মদকে এই সুখবরটি জানালাম।

কিন্তু তিনি এই কথা বিশ্বাসই করতে চাইছিলেন না। বরং কথাটি শোনার পর ইতস্তত করে বলতে লাগলেন, স্যার, আমি কি এ কাজটা পারবো? এই কাজটা একজন সুস্থ সবল যুবকেরই সাজে।

আমরা তাকে অভয় দিয়ে বললাম, সে আমরা দেখবো।

তিনি আচ্ছা বলে চলে গেলেন।

এই সিজনাল চাকরির মেয়াদকাল ডিসেম্বর থেকে এপৃল পর্যন্ত। এই কয়মাস দেখেছি তার মধ্যে ফাকি দেয়ার প্রবণতা নেই যেখানে অন্য সব পাহারাদার ফাকি দেয়াতে পটু। গ্রীষ্ম পেরিয়ে বর্ষা এলো। শেখ আহাম্মদ আবার তার আগের পেশায় ফিরে গেলেন। ইতিমধ্যেই ছন মওসুম শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই তার ছন কাটা ও বিক্রির কাজও বন্ধ। এই অবস্থায় তিনি মাঝে মধ্যে উপোস করে থাকতে আরম্ভ করলেন।

আমি আবার নিজে হাতে রান্না করে খেতাম। ছোট চাকরি করি। বেতন সামান্য। তাই সাধ থাকলেও বাবুর্চি বা কাজের লোক রাখার সাধ্য নেই।

তবুও তার দুরবস্থা দেখে তাকে একদিন ডেকে বললাম, আপনি আমার রান্না-বান্নাতে রাতের বেলা সাহায্য করবেন আর রাতের বেলা আমার এখানে একবেলা খাবেন। এবং দিনের বেলা পাহাড় থেকে কাঠ কেটে এনে ফকিরহাটে বিক্রি করবেন।

আমাদের এখান থেকে রাউজান ফকিরহাট অনেক দূর তা আগেই বলেছি। আর কাঠ সংগ্রহ ও চেরাই কাজটি অত্যন্ত পরিশ্রমের। তাও আবার টিলা-টক্কর পাহাড়ের উচু-নিচু স্থান থেকে সংগ্রহ করতে হয়। তারপর তা প্রসেস করে বিক্রি করা।

এই অতি পরিশ্রমের কাজ করতে করতে শেখ আহাম্মদ প্রায়ই রোগে পড়তে আরম্ভ করলেন। ভরা বর্ষা মরসুম আগত। কাদা-পানির কারণে পাহাড়ি রাস্তা অত্যন্ত পিচ্ছিল ও দুর্গম। পথ চলা দায়। এই ভরা বর্ষা মরসুমে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করা, তা শুকানো, তারপর তা বাজারে বিক্রি করা কাজটি অত্যন্ত মেহনতের।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দিখে শেখ আহাম্মদ ঘর ছেড়ে বের হচ্ছেন না। ব্যাপার কি? শেষে সবাই মিলে গিয়ে দেখলাম তিনি জ্বরে আক্রান্ত। গা পুড়ে যাচ্ছে আর প্রলাপ বকছেন। সেবা শুশ্রূষা করার নিকট আত্মীয় কেউ নেই। গার্ড পাঠিয়ে তার জরুরি ওষুধপত্র জোগাড়ের ব্যবস্থা করা হলো।

চিকিৎসা চলছে। কিন্তু জ্বর কমছে না। তার যা অবস্থা তাতে এই দুর্গম পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে থানা সদরে নেওয়া সম্ভব নয়। রোগ উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকলো, তার খাওয়া দাওয়া একদম বন্ধ। ক্রমেই তিনি নিস্তেজ হয়ে গেলেন, এমনকি কথা বলতে পারেন না।

আমরা দিন গুনতে লাগলাম।

বেশ কয়েকদিন পর একদিন সকালে দেখলাম তিনি মৃত অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছেন। তার মৃত্যুতে আমাদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এলো। কারণ ইতিমধ্যেই তার ব্যবহারে তাকে আমরা আপন করে নিয়েছিলাম এবং তিনি আমাদের খুবই ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন।

শেখ আহাম্মদের গ্রামের বাড়িতে খবর দেয়া হলো। এতো দিন যারা খোজখবর নেননি, এবার তারা এলেন তার শেষ সম্বল খোজার জন্য। কিন্তু তিনি তো নিঃস্ব। যা তার নিকট আত্মীয়রা না জানলেও আমরা তার ঘনিষ্ঠজন না হয়েও জানি।

তাকে আমাদের বাসার পশ্চিমে ইয়াসিন নগর গ্রামের কবরস্থানে দাফন করলাম।

শেখ আহাম্মদ নেই। কিন্তু তার স্মৃতি আজো আমাদের মাঝে অম্লান, যা আমার মনে হলে মন ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। কারণ তিনি ছিলেন আমার ওই সব নিঃসঙ্গ দিনগুলোর একমাত্র সঙ্গী। মিয়ানমারে থাকাকালীন তার সঙ্গে বার্মিজ মেয়ের প্রেম কাহিনী, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নানান অজানা কাহিনী, এছাড়া তার জীবনে ঘটে যাওয়া অনেক সুখ-দুঃখের, ব্যথা-বেদনার, পাওয়া না পাওয়ার ইতিহাস যা আমার কাছে তিনি প্রকাশ করেছিলেন অকপটে।

এই শাদাসিদে ভবঘুরে বৃদ্ধের মাটি যে এখানেই ছিল তা কে জানতো?

হবিগঞ্জ থেকে

ইনডিয়ান ফিল্ম মিউজিক

– শেখ সাজেদুল মজিদ সুমন

ইনডিয়ান ফিল্ম মিউজিক খুবই সমৃদ্ধ এবং আমাদের দেশের অনেক সঙ্গীত পিপাসু মানুষ এর ভক্ত। বুঝে হোক, না বুঝেই হোক গান শোনেন। আমিও তেমনি একজন ইনডিয়ান ফিল্ম সঙ্গীতের ভক্ত।

ফিল্ম সঙ্গীত শব্দটি যদিও সঙ্গীত হিসেবে তেমন উচু মান নির্দেশ করে না। তবুও ইনডিয়ান ফিল্ম সঙ্গীতের সঙ্গে জড়িত অনেক রথী, মহারথীরা একে অন্য রকম এক মর্যাদার আসনে নিয়ে গেছেন। এদের অনেকেই আমাদের দেশেও সঙ্গীত পিপাসুদের কাছে পরম পূজ্য।

সুরকার হিসেবে বলা যায় নৌশাদ, অনিল বিশ্বাস, সি. রামচন্দ্র, খেমচাদ প্রকাশ, শঙ্কর জয়কিষণ, রবি, মদনমোহন, ওপি নায়ার, রোশন (বর্তমান সময়ের হার্টথ্রব ঋতিক রোশনের দাদা), শচিন দেব বর্মন, তার যোগ্য উত্তরসূরি রাহুল দেব বর্মন, কল্যাণজি-আনন্দজি, লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল, বঙ্গ সন্তান সলিল চৌধুরী, বাপ্পি লাহিড়ি, ১৯৯০-র দশকে *আশিকি*-র মাধ্যমে ঝড় তোলা দুই সুরকার নাদিম-শ্রাবণ, যতিন-ললিত, আনু মালিক, রাজেশ রোশন, এআর রহমান। এসব নাম শুধু নাম নয়, এরা একেকজন ইনডিয়ান ফিল্ম সঙ্গীত জগতের সুর সম্রাট। যদিও উল্লিখিত নামগুলোর প্রথম দিকের নয় দশজনের সঙ্গে শেষের দিকে যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদের তুলনা চলে না।

তেমনিভাবে সাহির লুধিয়ানভি, গুলজার, ইনদিত্তর, আনন্দ বকশি, মজরুহ সুলতানপুরি, শৈলেন্দ্র, হসরত জয়পুরি, জাভেদ আখতার, সামিরসহ আরো অনেক গীতিকার তাদের শক্তিশালী কলমের মাধ্যমে একেকটি কালজয়ী গানের জন্ম দিয়েছেন।

মোহাম্মদ রফি, মুকেশ, কিশোর কুমার, মান্না দে, লতা মুঙ্গেশকর, আশা ভোসলে। এদের কণ্ঠস্বর সেই সব সৃষ্টিকে দিয়েছে পূর্ণতা। *কফি হাউসের সেই আড্ডাটা, তুমি কি সেই আগের মতই আছ*-সহ অনেক কালজয়ী বাংলা গানের গায়ক মান্না দে-র কণ্ঠে প্রাণের লিপে *উপকার* ফিল্মের *কসমে ওয়াদে প্যায়ার ওয়াফা সব বাতে হে বাতোকা কেয়া* কয়জন শুনেছেন? অথবা রাজকাপুরের *মেরা নাম জোকার* মুভিতে মান্না-র কণ্ঠে *এ ভাই, যারা দেখকে চল, আগে হি নেহি পিছে ভি,* এমন অজস্র মেলোডিয়াস গানের উদাহরণ দেয়া যাবে।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বাংলা গান তো অনেকেই পছন্দ করেন। হিন্দি ফিল্মের গানেও তিনি যথেষ্ট মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন। এক সময় ঝড় তোলা *নাগিন* সিনেমার সুরকার ছিলেন তিনি। এছাড়া *সোলওয়া সাল* সিনেমাতে দেব আনন্দের লিপে হেমন্তের কণ্ঠে *হ্যায় আপনা দিল তো আওয়ারা* কেউ কি ভুলতে পারবেন?

মনে পড়ে এভারগৃন দেব আনন্দের *গাইড* মুভিটি দেখে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলাম শচিন দেব বর্মনের জাদুকরী সুরে।

আমি অবশ্য বরাবরই ছোট কর্তা অর্থাৎ রাহুল দেব বর্মনের ভক্ত। বিশেষ করে আমার প্রিয় গায়ক কিশোরকুমারকে দিয়ে এমন সব গান তিনি গাইয়েছেন যেগুলোকে এক কথায় বলা যায়, স্বর্গীয় সৃষ্টি।

রাজেশ খান্না ছিলেন খুব ভাগ্যবান। রাহুল দেব বর্মন ও কিশোরকুমার যুগলবন্দির সেরা সৃষ্টির বেশির ভাগ পেয়েছেন তিনি। এরপরে অমিতাভ ও ঋষি কাপুর।

খুব আঘাত পেয়েছিলাম রাহুল দেব বর্মন মারা যাওয়ার পর। ইনডিয়ান সঙ্গীত যে কি হারালো তা তারাও জানে না। শুনে দেখুন আরেকটিবার তার সর্বশেষ সৃষ্টি 1942, A Love Story মুভির গানগুলো। একেই বলে মাস্টারপিস।

এবার সাম্প্রতিক প্রসঙ্গে আসি। বর্তমানে ইনডিয়ান ফিল্ম মিউজিক অন্য রকম যেন হয়ে গেছে। মাঝে মধ্যে দুই একটি অ্যালবাম পাওয়া যায় শোনার মতো। আগের মতো মেলোডিয়াস গান খুব কমই পাওয়া যায়। ভাবতে অবাক লাগে *নিকম্মা কিয়াইস দিল নে, ডি ডাং ডিং ডোলে*-র মতো অর্থহীন কথা ও সুরের গানও আজকাল দর্শকপ্রিয় হয়ে যায়।

মাঝে মধ্যে বিভিন্ন কাণ্ড দেখে খুবই হাসি পায়। যেমন বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় গায়ক সনু নিগম। তিনি গায়ক হিসেবে খুবই প্রতিভাবান সন্দেহ নেই। তবু কি যে ভূত মাথায় চাপলো! তিনি ভাবলেন, আমাকেও কিশোরকুমার হতে হবে। যেই ভাবা সেই কাজ। ফলাফল? *জানি দুশমন, কাশ আপ হামারি হোতে* ও *লাভ ইন নেপাল* নামের গাজাখুরি অভিনয় সমৃদ্ধ তিনটি অশ্বডিম্ব।

অনেকে বলতে পারেন, কিশোরকুমার পারলে সনু নিগম কেন পারবেন না? তাদের জ্ঞাতার্থে বলি, ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করলেই কাক ময়ূর হয়ে যায় না। উদাহরণ চান? তাহলে উল্লিখিত ওই অশ্বডিম্ব তিনটির পাশাপাশি কিশোরকুমার অভিনীত *মিস্টার এক্স ইন বম্বে, চলতি কা নাম গাড়ি* ও *পড়োশন* দেখুন। জবাব পেয়ে যাবেন। বোনাস হিসেবে পাবেন কিশোরের স্বকণ্ঠের শ্রুতিমধুর কিছু গান।

মেজরটিলা, সিলেট থেকে

shumonsgalaxy@hotmail.com

বুর্জ আল- আরব

– জান মহাম্মদ

Burj বা *বুর্জ* শব্দের অর্থ হচ্ছে টাওয়ার বা উচু দালান। Al-Arab বা আল–আরব শব্দের অর্থ হচ্ছে আরবীয়। বুর্জ আল আরব হোটেলের মূল অর্থ হচ্ছে অ্যারাবিয়ান টাওয়ার হোটেল।

দুবাই শহর থেকে পনেরো কিলোমিটার দূরে এর অবস্থান। এর পাশ দিয়ে যে রোড দুবাই থেকে আবু ধাবি চলে গেছে তার নাম জুমিরা রোড। জুমিরা বিচ থেকে দুইশ মিটার দূরে এই হোটেলটির অবস্থান যা দেখতে *সেইল শেপড বিল্ডিং* বা *পাল আকৃতি ভবন।*

১৯৯৪ সালে এর কাজ শুরু হয়। ১৯৯৯ সালে শেষ হয়। মানুষের তৈরি একটি দ্বীপের উপর অবস্থিত এই হোটেলের উচ্চতা ৩২১ মিটার। চল্লিশ মিটার পানির নিচ থেকে এর পাইলিং শুরু হয়। সর্বমোট সাতাশ তলা। কিন্তু হিসাব অনুযায়ী চুয়ান্ন তলার সমমানের কারণে সুইটগুলো ডুপলেক্স। বুর্জ আল–আরব প্যারিসের আইফেল টাওয়ার থেকে উচু এবং নিউ ইয়র্কের এমপায়ার স্টেট বিল্ডিং থেকে উচ্চতায় ষাট মিটার কম।

উচ্চতার দিক দিয়ে বিশ্বের কোনো হোটেল এতো উচু নয় যার নির্মাণ কৌশল অত্যন্ত শৈল্পিক। এখানেই এর স্থপতির সৃষ্টির কৃতিত্ব। হোটেলটি দুই দিক থেকে গ্লাস এবং সামনের দিকটা শাদা পর্দা দিয়ে আটকানো যার মেয়াদ একশ বছর। রাতে লাইটের ফোকাস করা হয় এর সামনের রাস্তা থেকে যা ওই পর্দায় গিয়ে পড়ে। সাতটি রঙয়ের সংমিশ্রণ এবং আরব আমিরাতের আধুনিক পরিচয় যিনি সষ্টি করেছেন তার নাম শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহাইয়ান–এর ছবি। উপরে রয়েছে হেলিপ্যাড। বিশ্বের টপ ভিআইপিদের এয়ারপোর্ট থেকে হেলিকপ্টারে নিয়ে আসা হয়। যেমনটি দেখেছি আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন–এর আগমনের সময়।

এ হোটেল দিয়ে দুবাই বিশ্বের পর্যটকদের কাছে বেশি পরিচিত। হোটেলের ভেতরটায় যেসব রঙ–বেরঙের ফার্নিচার এবং ডেকোরেশন সামগ্রী রয়েছে তা অত্যন্ত দামী এবং প্রসিদ্ধ। আর সে জন্যই একে বলা হয় মোস্ট লাকশারিয়াস হোটেল অফ দি ওয়ার্ল্ড।

বুর্জ আল- আরব সুইট (Suite) : দুইশ দুটি সুইট নিয়ে বুর্জ আল–আরব। ডিলাক্স সুইট একশ সত্তর স্কয়ার মিটার। ভাড়া পাচ হাজার পাচশ দেরহাম। পেনারামক সুইট দুইশ পচিশ থেকে তিনশ পনেরো স্কয়ার মিটার যার ভাড়া হচ্ছে ছয় হাজার দেরহাম।

এক দেরহাম মানে সতেরো দশমিক পচিশ টাকা। অর্থাৎ পেনারামক সুইটের ভাড়া প্রতি দিন বাংলাদেশি টাকা ১০৩,৫০০।

ক্লাব সুইট তিনশ ত্রিশ স্কয়ার মিটার যার ভাড়া সাত হাজার দেরহাম। টু বেডরুম ডিলাক্স সুইট তিনশ পয়ত্রিশ স্কয়ার মিটার এগারো হাজার দেরহাম। থ্ বেডরুম ডিলাক্স সুইট ছয়শ সত্তর স্কয়ার মিটার এক লাখ পনেরো হাজার দেরহাম। প্রেসিডেনশিয়াল সুইট ছয়শ সাতষট্টি স্কয়ার মিটার ত্রিশ হাজার দেরহাম এবং রয়াল সুইট সাতশ আশি স্কয়ার মিটার সাতত্রিশ হাজার দেরহাম। এছাড়া রয়েছে শতকরা দশ ভাগ সার্ভিস চার্জ এবং শতকরা দশ ভাগ মিউনিসিপালিটি ফি। নাশতা এবং খাওয়া এর মাঝে নয়। গেস্ট তার ব্যক্তিগত পয়সা দিয়ে ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করবে। রোলস রয়েসের ভাড়া প্রতি ঘণ্টায় দুই হাজার দুইশ দেরহাম বাংলাদেশি টাকা ৩৭,৯৫০।

স্যুইটে যেসব সুযোগ–সুবিধা গেস্ট যা পাবে তা হলো : ল্যাপটপ কমপিউটার, ডাইনিং, কিচেন, *জাকুজি বাথ।* এছাড়া খুব দামি কম্পানির সাবান, শ্যাম্পু, মিনিবার, কুল, বাথরোব এবং কিমোনো।

রিজারভেশন : গেস্টের আসার আগে অবশ্যই তার রিজারভেশন থাকতে হবে। আর তার রিজারভেশনের ওপর সুইট সাজানো হবে। যে সকল গেস্টের স্মোকিং হ্যাবিট থাকবে তাদের জন্য স্মোকিং সুইট। এলার্জির কারণে অনেক গেস্ট ফ্লাওয়ার পছন্দ করে না। বেড মেকিংয়ের বিষয়ে নির্দেশনা থাকতে পারে। যেমন হার্ড ম্যাটরেস অথবা সফট ম্যাটরেস। স্পেশাল গেস্টদের জন্য স্পেশাল গিফট দেয়া হয় যেমন স্পেশাল ফ্লাওয়ার, চকলেট।

গেস্টদের অভ্যর্থনা : গেস্টের রিজারভেশনের মাধ্যমেই জানা যাবে গেস্ট কবে, কখন এবং কোন এয়ারলাইন্সে আসবে। এয়ারপোর্টে এজেন্টরা গেস্টকে প্রথম অভ্যর্থনা জানাবে। সেখানে থাকবে দুজন মেয়ে। এরা মরক্কিয়ান, রাশিয়ান, উজবেক হতে পারে। তারপর হোটেলের গাড়ি করে গেস্ট আসবে হোটেলে। ড্রাইভার দেখতে অনেকটা নৌ বাহিনীর পোশাক পরা একজন সৈনিকের মতো। হোটেলে আসার পথে ড্রাইভার জানিয়ে দেবে তার কতো সময় লাগবে।

গেস্ট হোটেলে আসার পর ফ্রন্ট ডেস্ক থেকে তাকে অভ্যর্থনা জানাবে দুজন মেয়ে যাদের পরনে থাকবে অ্যারাবিয়ান পোশাক। একজনের হাতে অ্যারাবিয়ান খেজুর, অন্যজনের হাতে গোলাপ জল। তাছাড়া রয়েছে ধুপ দেয়া।

এরপর গেস্টকে নিয়ে যাওয়া হবে তার ফ্লোরে। প্রতিটি ফ্লোরে আছে একজন *জিএসই* গেস্ট সার্ভিস এক্সিকিউটিভ এবং একজন বাটলার (Butler)। গেস্ট কখন বাইরে গেল তার নোট থাকবে জিএসই-র কাছে। কারণ গেস্ট যখন বাইরে যাবে তখনই গেস্টের রুম ক্লিন করতে হবে। গেস্টকে ভেতরে রেখে করা যাবে না। গেস্ট এসে দেখবে সব কিছুই সুন্দর করে সাজানো-গোছানো। এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড সার্ভিস। গেস্ট রুম ইউজ করার পর যখনই বাইরে যাবে ঠিক তারপরই আবার সার্ভিস হবে। এটা চব্বিশ ঘণ্টাই চলে, অন্য হোটেলে এমন দেখা যায় না। তাছাড়া রয়েছে টার্ন ডাউন সার্ভিস। সন্ধ্যায় গেস্ট না থাকলে তার বেড কভার সরিয়ে পিলো, চকলেট এবং পানির বোতল দিতে হবে। ডিম লাইট জ্বালিয়ে দিতে হবে।

রেস্টুরেন্ট : সর্বমোট সাতটি রেস্টুরেন্ট রয়েছে। তার মাঝে একটি বিচ এবং পুলবার রেস্টুরেন্ট। বাকি রেস্টুরেন্টগুলোর নাম আল মাহারা সি ফুড এবং চায়নিজ রেস্টুরেন্ট। এই রেস্টুরেন্টের মধ্যে বিশাল একুইরিয়ামটিতে আছে একশ প্রজাতির সাগরের ছোট থেকে বড় হাঙর মাছ। বিশ্বের দশটি রেস্টুরেন্টের মাঝে ২০০৩-এ এটি প্রথম স্থান অধিকার করে। *আলমুনতাহা* অ্যারাবিয়ান গালফ হতে দুইশ চল্লিশ মিটার উচুতে আরেকটি রেস্টুরেন্ট। ইওরোপিয়ানদের জন্য এই রেস্টুরেন্ট। তবে যে কোনো গেস্ট সেখানে গিয়ে খেতে পারে। রয়েছে নামি-দামি মদ। আল-আইওয়ান রেস্টুরেন্টু ফার্স্ট ফ্লোরে। ব্রেকফাস্ট এবং ডিনারের জন্য খুব বিলাস বহুল জিনিস দিয়ে এর ডেকোরেশন। ২০০৪-এ দশটি রেস্টুন্টের মাঝে এটি প্রথম হয়।

এছাড়া বাব আল আইয়াস পুলবার, সান ইদার কফি শফ, এবং জুনা বার আছে। বিচে রয়েছে *মজলিস আল বাহার* যেখানে গেস্টরা সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত বিচে থাকে। পুরুষদের জাঙিয়া পরে আর মেয়েরা বিকিনি পরে। এর জন্য এ দেশের সরকারের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার বাধা নেই।

হেলথ ক্লাব : আঠারো তলায় রয়েছে দুটো সুইমিং পুলসহ খুব সুন্দর হেলথ ক্লাব। পুরুষ এবং মহিলাদের আলাদা ব্যবস্থা। সেখানে রয়েছে হেলথ থেরাপিস্ট এবং বিউটি পার্লার।

ম্যানেজমেন্ট : বৃটিশ ম্যানেজমেন্ট দিয়ে বুর্জ আল-আরব পরিচালিত। এখানকার স্টাফ রয়েছে এক হাজার পাচশ-র বেশি। এতো বিশাল হোটেলে চব্বিশ ঘণ্টা যে একটা সুন্দর অপারেশন হচ্ছে তা না দেখলে বোঝা যাবে না। কাজের ব্যাপারে কোনো প্রেশার নেই। কিন্তু গাফিলতিও কেউ করতে পারছে না। সব সময় ম্যানেজমেন্ট দেখছে কোথায় সমস্যা হচ্ছে। তার ওপর নিচ্ছে দ্রুত পদক্ষেপ। অন্যথায় গেস্ট অসুখী হবে। স্টাফদের সঙ্গে ম্যানেজমেন্টের সম্পর্ক ভেরি ফ্রেন্ডলি। ভুলের জন্য ক্ষমা আছে। কিন্তু একই ভুল বার বার হলে অ্যাকশন নেয়া হয়।

সিকিউরিটি : গেস্টের লাগেজ থেকে শুরু করে সব কিছুই গৃন চ্যানেলে রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। তাছাড়া মেইন গেটে গাড়ি স্ক্যানার রয়েছে মাটির নিচে। যাওয়া এবং আসার পথে স্টাফদের জিনিসপত্রও চেক করা হয়।

এওয়ার্ড : এই হোটেল পেয়েছে ২০০০ ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল এওয়ার্ড।

গিনেস বুক অফ রেকর্ড : ২০০০ সালে গিনেস বুকে স্থান পেয়েছে *ওয়ার্ল্ডস টলেস্ট অল সুইট অ্যান্ড মোস্ট লাকশারিয়াস হোটেল* হিসেবে।

২০০৩ এ ইন্সটিটিউশনাল ইনভেস্টরস ম্যাগাজিন পাঠকদের ভোটে বুর্জ আল আরব নির্বাচিত হয় *দি নাম্বার ওয়ান হোটেল ইন দি ওয়ার্ল্ড।*

ISO : এই হোটেলের আছে একটি বিশেষ সার্টিফিকেট, International organization for standards 9000-2000। বিশ্বের কোনো হোটেলের এই সার্টিফিকেট নেই। তাছাড়া রয়েছে Sop. Standard Operation Procedure যার অধীনে আছে Mission Statement of Burj Al Arabs এতে লেখা রয়েছে এই হোটেলের ছয়টি গাইডিং পৃন্সিপলস ও হলমার্ক - বা মূলনীতি। গাইডিং পৃন্সিপলস হচ্ছে :

1. Integrity বা সততা
2. Team work বা টিম ওয়ার্ক

3. Recognition বা স্বীকৃতি

4. People Focus বা কাস্টমার মুখী

5. Continuous growth বা অব্যাহত অগ্রগতি

6. Innovation বা উদ্ভাবন

হলমার্ক হচ্ছে: Smile and greet the guest before the guest greets `u'. অর্থাৎ গেস্টরা আপনাকে অভিবাদন জানানোর আগেই আপনি হাসিমুখে গেস্টকে অভ্যর্থনা জানান।

Never say no to our guest. অর্থাৎ আমাদের গেস্টকে কখনোই না বলবেন না।

Always treat your colleagues with respect as you would like to be treated. অর্থাৎ সব সময়ই আপনার সহকর্মীদের সঙ্গে এমন শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করবেন যেমন ব্যবহার আপনি তার কাছ থেকে আশা করেন।

গেস্টদের সন্তুষ্টির ওপর প্রতি মাসেই রিপোর্ট হচ্ছে যাকে বলা হয় Customer's Satisfaction Index (কাস্টমার্স স্যাটিসফেকশন ইনডেক্স) বা কাস্টমারদের সন্তুষ্টি সূচক। একজন গেস্ট চলে যাওয়ার সময় এই ফরম পূরণ করে তার মতামত লিখে দিয়ে যায়।

এসব কারণেই বিশ্বের সর্বোচ্চ এবং সবচেয়ে বিলাস বহুল হোটেল বুর্জ আল-আরব বিশ্বের সেরা হোটেল।

দুবাই থেকে

নিমন্ত্রণ

– মোহাম্মদ আখতারউজ্জামান

সেদিন অফিসে এসে একটা বিয়ের কার্ড পেলাম। হিন্দু ছেলের বিয়ে। কার্ডটা দিয়েছে তার নানি।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েই স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠলো সেদিনের সেই ঘটনাগুলো। এতো দিন অতিক্রান্ত হলেও তারা আমাকে ভোলেনি।

সেই দেড় মাসের এক ফুটফুটে বাচ্চাটার আজ বিয়ে!

ভাবতে অবাক লাগছিল।

১৪ এপৃল ১৯৭১। ইনডিয়ায় পালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হলাম রাত দশটার দিকে। সারা রাত অনেক লোকের সঙ্গে হেটে ভোরের দিকে পৌছালাম নদীর ঘাটে। নৌকা ঠিকঠাক করতে দুপুর পেরিয়ে গেল। অনেকগুলো হিন্দু পরিবারের সঙ্গে একত্রে নৌকায় উঠে বসলাম। যাত্রা শুরু হলো অজানার দিকে। পেছনে ফেলে এলাম জন্মভূমি।

সেই খেয়েছি আগের দিনে রাত নয়টায়, এরপর আর খাওয়া হয়ে ওঠেনি। ক্ষিধে দুশ্চিন্তায় যখন নৌকার মাঝে বসে আছি তখন পশ্চিম আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল। মাঝিরা জানপ্রাণ দিয়ে নৌকাটাকে ওপারে বালুচরে যখন ভেড়ালো তখন মুষলধারে বৃষ্টি ও ঝড় শুরু হয়ে গেছে।

প্রায় দুই ঘণ্টা একটানা ঝড় আর বৃষ্টির পর দেখলাম পাশে এক মহিলা কাত হয়ে পড়ে আছে। কোলে তার দেড় মাসের বাচ্চা। মহিলার নড়াচড়া নেই। কিন্তু বাচ্চাটা শুধু থর থর করে কাপছে।

অতো কিছু বোঝার চেষ্টা না করে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়ে দৌড়ালাম ইনডিয়া সীমান্তের দিকে। বিএসএফ ক্যাম্পে পৌছে সবার বিপদের কথা জানিয়ে বাচ্চাটাকে জ্বলন্ত চুলার ধারে নিয়ে একটু সেকা দিতেই কেদে উঠলো বাচ্চাটা।

তারপর আস্তে আস্তে বিএসএফ-এর সহায়তায় যখন সবাই এসে পৌছালো তখন জানলাম বাচ্চাটার মা আর এ দুনিয়াতে নেই। ওখানেই পড়ে মারা গেছে।

সবারই মনে বিষাদের ছায়া।

বাচ্চাটাকে তার নানির হাতে তুলে দিয়ে চলে এলাম।
দেশ স্বাধীন হলো। ফিরে এলাম নিজ দেশে। লেখাপড়ার জন্য গেলাম শহরে। ভর্তি হলাম রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে।
বাড়ি গিয়ে শুনতাম ছেলেটার বাবাও ইনডিয়ায় গিয়ে শরণার্থী শিবিরে কলেরাতে মারা গেছে আর সেই থেকেই ছেলেটা তার নানির কাছে থেকে লেখাপড়া করছে। কেন জানি কখনো দেখার ইচ্ছে হয়নি। তবে খবর রাখতাম।
আজ এতো দিন পর সেই ছেলের বিয়ের নিমন্ত্রণ পেয়ে ফেলে আসা সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল।
পরিবারের সবা-ই বিয়েতে যাওয়ার জন্য উৎসাহ ছিল।
কাজের তাগিদে রাজশাহী থাকি। তাই একটা রাজশাহী সিল্ক শাড়ি নিয়ে যথাসময়ে হাজির হলাম। দেখলাম সেই দেড় মাসের শিশু আজ যৌবনে পদার্পণ করেছে।
গাড়ি থেকে নামতেই আমাকে দেখে ছুটে এলো।
বললাম, তুমি রামেন।
হ্যা কাকু। বলে সে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো। কাদতে কাদতে শুধু বললো, কাকু, আপনি আমার দ্বিতীয় জন্মদাতা। আপনার জন্যই তো আজ আমি বেচে আছি। আমি নানির কাছে সব জেনেছি। সব শুনেছি।

গোপালপুর, নাটোর থেকে

ঈদ গ্যানজাম

– শফিকুল ইসলাম

এক.

আফজাল খানের সাত ছেলে। কেউ চাকরি করে, কেউ ব্যবসা করে আবার কেউ বা মিডল ইস্টে থাকে। ছেলেরা কেউ বাড়িতে না থাকায় গ্রামের করিম মাতব্বর তাকে পাত্তাই দেন না।
মসজিদের সভাপতি পদ কেড়ে নিয়ে সব দায়দায়িত্ব করিম মাতব্বর বুঝে নিয়েছেন।
ঈদের দিন তার কথায় মসজিদের কার্যক্রম হবে না এটা আফজাল খান মেনে নিতে পারেন না। তাই সব ছেলেকে তিনি এবার ঈদে বাড়িতে আসতে বলেছেন। এর একটা বিহিত করতেই হবে।
আফজাল খানের অসম্মানের কথা শুনে সুদূর মিডল ইস্ট থেকে তার ছেলেরা বাড়িতে চলে আসে।
ঈদের দিন আফজাল খান তার সাত ছেলেকে নিয়ে মসজিদের উদ্দেশ্যে পা বাড়ান। কিন্তু তাদের যাওয়ার আগেই করিম মাতব্বরের কথায় ইমাম সাহেব নামাজে দাড়িয়ে যান।
আফজাল খানের সাত ছেলে হুমকি দেয় আমার বাপেরে ছাড়া নামাজে দাড়ায় এতো বড় সাহস কার?
করিম মাতব্বরের ছেলেরাও কম না। তাই নামাজ শেষ হতে না হতেই দুই পক্ষ আত্মমর্যাদার লড়াইতে গ্যানজাম শুরু করে।

দুই.

ঈদ এলেই বাদী ওৎ পেতে থাকে আসামিকে ধরার জন্য। আসামিরা অন্ততপক্ষে ঈদের দিন পরিবারের সঙ্গে থাকার চেষ্টা করে। চাদ রাতে বাদী সুযোগ বুঝে পুলিশ নিয়ে আসামির বাড়িতে হানা দিয়ে আসামিকে পাকড়াও করে। আসামি ঈদ করতে পারবে না বলে ঈদের দিন বাদী-বিবাদী গ্যানজামে লিপ্ত হয়।

তিন.

রাসেলের তিন ভাই ইটালি থাকে। দেমাগে সে মাটিতে পা ফেলে না। স্কুল মাস্টার জব্বারের মেয়ে রীনার পেছনে ঘুর ঘুর করছে অনেক দিন।
কিন্তু রীনা তাকে পাত্তা দেয় না। ঈদের আগের দিন রাসেল ভাবে, বিদেশি কসমেটিকস ও অন্যান্য দামি কিছু দিয়ে তার মন গলানো যায় কি না।
রাসেল এক বস্তা উপহার সামগ্রী ও দামি কসমেটিকস নিয়ে রীনার সামনে হাজির হয়।
রীনা সব উপহার সামগ্রী রাসেলের মুখে ছুড়ে ঘরের অন্দরে চলে যায়।
রাসেল এই অপমান সইতে না পেরে ঈদের দিন ভোরে এক ডজন চ্যাংড়া ছোকরা নিয়ে রীনাকে তুলে আনতে গিয়ে গ্যানজাম বাধিয়ে ফেলে।

চার.

আক্কাস মিয়ার জামাই প্রথম রোজা থেকে দাবি করে আসছেন এবার তাকে কমপ্লিট সুট বানিয়ে দিতে হবে।
আক্কাস মিয়ার একই কথা, কামলা খেটে খাওয়া জামাইকে কমপ্লিট সুট দিয়ে লাভ নেই। তাই তিনি জামাইয়ের জন্য লুঙ্গি, জামা পাঠান।
ঈদের দিন ভোরে সেমাইতে লবণ কম হয়েছে ছুতা দেখিয়ে আক্কাস মিয়ার মেয়েকে বেদম পিটুনি দিয়ে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে নতুনভাবে গ্যানজামের সৃষ্টি করে।

পাচ.

গ্রামের মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বাস করে। তাই ঈদ এলে সমাজের মাতব্বরদের মানুষকে খাওয়াতে হয়। একে বলে সমাজ খাওন।
মজিদের প্লেটে মাংস কম পড়ায় তাই তিনি চেচামেচি করে গ্যানজাম বাধিয়ে ফেলেন।

ছয়.

লায়লা ভাবছে এই ঈদে শান্টু তাদের বাড়িতে আসবেই। তাই সে মনের মতো রঙ এবং বাজারের যতো রঙ মিশিয়ে সকাল থেকেই সাজতে থাকে। বেলা গড়ায়। কিন্তু শান্টুর দেখা নেই। ঈদের সেমাই সে মুখে দেয় না, শান্টুর অপেক্ষায় থাকে। তার ভাবীর কি এক কথায় লায়লা কান্না শুরু করে আর বলে, আমারে কি শাড়ি আইন্না দিছে কেউ ভালো কয় না, আমি সেমাই মুখে দিমু না।
লায়লার ভাই ভাবছেন তার বোনকে তার বৌ কিছু বলেছে। তাই স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া বেধে বিরাট গ্যানজামের রূপ নেয়।

সাত.

জসিম চার সন্তানের জনক। কয়দিন হলো বড়টা মারা গেছে। তাতেও তার চিন্তা দূর হয়নি। বাকিগুলোর জন্য কিভাবে পোশাক কিনবেন? দুধ, চিনি, সেমাই বা কিভাবে কি নেবেন? কোনো দিশা না পেয়ে চাদের রাতে জসিম বাজারে গিয়ে গ্যানজাম বাধানোর চেষ্টা করেন। যাতে কোনো ব্যবস্থা হয়।
এক পর্যায়ে শহর ফেরত এক লোকের পায়ে পারা দিয়ে তিনিই পাক খেয়ে পড়ে যান। লোকজন এসে ভিড় করলে তিনি বলেন, *ওই শহরের লোক তাকে ধাক্কা দিয়া ফালাইয়া দিছে।* তার পকেটে টাকাও ছিল। গরিব মানুষ বলে লোকজন শহর ফেরত লোকের ওপর রুষ্ট হয়। তাই সবাই মিলে তিনশ টাকা জরিমানা করে। জসিম কিছু কেনাকাটা করেন আর ভাবেন, যাক, বাড়ির গ্যানজাম থেকে তো কিছু রক্ষা পাওয়া গেল।

আট.

স্বামী প্রবাসী। চাদ রাতে বাশ বাগানে ফষ্টি–নষ্টি করতে গিয়ে ধরা পড়ে তার বৌ। ঈদের দিন সে পাগল সেজে গ্যানজাম পাকায়। লোকজন এলে দা, বটি নিয়ে তাড়া করে। যাতে লোকজন বুঝতে পারে সে বাগানে এমনি যায়নি, ভূত তাকে নিয়ে গেছে।

নয়.

রফিজ মৌলভির বাড়ির সীমানায় বোমা ফাটায় গায়ের দুষ্ট ছেলে হারু। রফিজ মৌলভি বিলাপ করতে থাকে তার বাড়ির সব ফেরেশতা বোমের আওয়াজে চলে গেছে। বাড়িতে ফেরেশতা না থাকলে তার ঈদ হবে না। তাই সে হারুদেরও ঈদ করতে দেবে না। সকালবেলা হারুর বাড়ির সীমানায় লাঠি নিয়ে বেশ হই চই করে গ্রামশুদ্ধ মানুষ ডেকে গ্যানজাম বাধিয়ে ফেলে।

গংগানগর, শরীয়তপুর থেকে

দ দিয়ে ফিঙে পাখি

– ফৌজিয়া আক্তার

ছোটকালে নানা আমাদের খুব ভালোবাসতো যা এখনো ভুলতে পারি না।

নানাবাড়িতে আমরা কয় ভাইবোন বেড়াতে যেতাম। নানা মজার মজার গল্প শোনাতেন। গালিভারের কাহিনী তার কাছ থেকেই প্রথম শুনি।

শীতে বাড়িতে গেলে নানা গাছিকে বলে রাখতেন ভোরে খেজুরের রস দিতে। ওই রস দিয়ে নানান রকম পিঠা খাওয়া চলতো। বিশেষ করে রসে ভেজানো চিতই পিঠা ভোলার মতো না।

গরমে নানাবাড়িতে যাওয়া পড়লে, নানা আমায় হাতপাখা দিয়ে প্রায় সারা রাত বাতাস করতো। এ রকম অনেক কথা নানাকে নিয়ে স্মৃতি হয়ে আছে। লিখতে গেলে শেষ হবে না।

নানাভাই গাছের ফল কোনটা পাকলো, আমাদের তা এনে খাওয়াতেন। আমরা নাতিরা কি করলে খুশি থাকবো সে কাজে ব্যস্ত থাকতেন।

নানা একটি পাখির ছবি আকতেন। তা এখনো মনে আছে। আমরা তখন খুব আনন্দ পেতাম। সেটা হলো ব্যাঞ্জনবর্ণের 'দ' অক্ষর দিয়ে ফিঙে পাখির ছবি আকা। তার সঙ্গে সুর করে করে ছড়া কাটা। এভাবেই ডালে বসা ফিঙে পাখি হয়ে যেতো।

পাঠক, আপনারাও একে দেখুন না ফিঙে পাখিটা!

'দ'–এর হইছে মাথা ব্যথা
শূন্য আসছে দেখতে।
বাইশজন আসছে কবিরাজ,
পিড়ি দিলাম বসতে।
পেটের মধ্যে কেউচ্চা। (কেচো)
এক টানে ফেউচ্চা। (ফিঙে)

নিরালা খুলনা থেকে

প্রতিক্রিয়াশীল

– তাজকেরা খানম নীলু

বৌ আমাকে কালু খান নামে ডাকে।

অবশ্য আমি দেখতে শুনতে যে কিসিমের তাতে কাছে এ নামটা তো নস্যি। এক কথায় আমার চেহারা-সুরতের বর্ণনা দিতে গেলে সংক্ষেপে বলতে হয় আফগানিস্তানের রিলিফ ক্যাম্প। সেই আমি যখন সর্বগুণে গুণান্বিতা একটা বৌ পাই তখন নিজের ভাগ্যকে নিজেই হিংসা করতে শুরু করি। স্বভাব-চরিত্রেও ছিলাম বাউন্ডুলে স্বভাবের। নিজের মাঠে চরে বেড়াই আবার এর-তার ঘরেও টোকা দিই।

অন্য কোনো কারণে না, আডডায় গলাবাজি করার জন্য যখন গলার ভেতর চুলকানি শুরু হয়, কেবল তখনই লাফালাফি শুরু করি। বৌ আমার এ অভ্যাস দূর করার জন্য অনেক তেলেসমাতি কাণ্ডকারখানা ঘটিয়েছে। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া স্বরূপ আমিও কিছুদিন ঝিম মেরে থাকি। আবার ওষুধের অ্যাকশন কমে গেলে লাফাতে শুরু করি। মনের দুঃখে এক সময় বৌকে দুটো একটা শক্ত অপবাদও দিই। তুমি সেনসেটিভ, প্রতিক্রিয়াশীল ইত্যাদি।

বৌ বলে, সেনসেটিভ, প্রতিক্রিয়াশীল আমরা সাধারণ মানুষেরাই। তা না হলে অসাধারণ বা এলিয়েন হতে হবে।

বৌ আমাকে অনেক চোখে চোখে রাখে। কিন্তু অফিসে আদালতে তার অনুসন্ধানী চোখ তো আর চরে বেড়াতে পারে না। ফলে সেখানে আমি পূর্ণমাত্রায় স্বাধীন। সেই স্বাধীনতার সুখ আস্বাদন করে যখন বাড়ি ফিরি তখন আমি বৌয়ের আজ্ঞাবহ স্বামী। আসলে আমি সরলমনা বৌকে অনেকখানি ভালোবাসি। তাই তাকে কষ্ট দিয়ে মনে স্বস্তি পাই না।

তবুও মাঝে মধ্যে স্বভাবগত কারণে স্বর্গে থেকেও ধান ভানা শুরু করি আর সৃষ্টিকর্তার ইশারায় বৌয়ের হাতে ধরা পড়ে নাকানি-চুবানি খাই। কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাটিই না হয় বর্ণনা করি।

অফিসের কাজে অন্য এক অফিসে ফোন করে চেনা-জানা এক ভদ্রলোককে চাইলাম। ফোন ধরলো এক মেয়ে। বললো, সে ভদ্রলোক অফিসে নেই। আগ বাড়িয়ে বললো, আমি আপনার কোনো সাহায্যে লাগতে পারি?

ধন্যবাদের সঙ্গেই বললাম, না, আসলে আমার কিছু তথ্য দরকার, আর সেগুলো কেবল সে ভদ্রলোকের কাছেই পেতে পারি।

মেয়েটা আমার এমন প্রশংসা করলো তাতে মোমের মতো গলে ফস করে অফিসের ফোন নাম্বার দিয়ে দিলাম।

এরপর একদিন অফিসে ফোন করলো। আকুলি-বিকুলি করে বললো, আমার কণ্ঠ তার এক প্রেমিকের মতো মনে হয় যাকে সে কোনোদিন ভুলতে পারবে না। তাই আমাকে বন্ধু ভেবে কিছু কষ্টের কথা বলে হালকা হতে চায়। যদি শুনতে রাজি হই তাহলে যেন বাসার ঠিকানা দিই।

বাসার ঠিকানা চাইতেই আমার চোখে ভেসে উঠলো দা নিয়ে তেড়ে আসছে বৌ। আগে একবার কথায় কথায় সে বলেছিল, যদি কোনোদিন আমার সঙ্গে কোনো মেয়ের সম্পর্কের কথা সে জানতে পারে তাহলে আমাকে দা দিয়ে জায়গা মতো একটা কোপ দিয়ে সে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে থাকবে - কথাটা মনে হতেই বাস্তবে ফিরে আসি। আসলে আমারও তার দুঃখের কথা শোনার জন্য মনের মধ্যে আকু-পাকু শুরু হয়। অনেক দিন ধরে গল্পের একটা প্লট খুজছিলাম। মনে হলো তার কাহিনী শুনলে শুধু প্লট না, একটা বড়সড়ো ফ্ল্যাটও পেয়ে যেতে পারি। এই চিন্তা করে বাসার ফোন নাম্বার দিলাম। বলে দিলাম রাত বারোটার আগে যেন ফোন না করে।

রাতে বৌকে নানান কাজের ফিরিস্তি দিয়ে বললাম, তুমি ঘুমাও। আমাকে রাতভর কাজ করে এই ফাইল সকালে অফিসে জমা দিতে হবে।

বৌ ঘুমিয়ে গেল।

রাত একটায় ফোন পেলাম তার। সিনেমার কাহিনীকেও হার মানাবে সে কাহিনী। নষ্ট হয়ে যাওয়া সে কাহিনী শুনে মনে বিশেষ কোনো সিমপ্যাথি জন্মালো না। তবুও বললাম, জীবনটাকে নিয়ে এভাবে খেললেন। এটা তো কোনো ভালো মেয়ের কাজ না। সে নানান সীমাবদ্ধতার কথা বললো। কথা বলতে বলতে রাত তিনটা বেজে গেল। তখনো নানান পর্যালোচনা করছি খুটিনাটি বিষয় নিয়ে। ঠিক তখনই আমার বৌ শান দেয়া দুই চোখ দিয়ে খপ করে ফোনের রিসিভার কেড়ে নিল।

আমিও চট করে লাইন বিচ্ছিন্ন করে দিলাম। উল্টো দোষ চাপিয়ে বললাম, হায়! হায়! ফোন বিচ্ছিন্ন করলে কেন? কুদ্দুস সাহেবের সঙ্গে কথা বলছিলাম। এই কাজের কিছু তথ্য নিচ্ছিলাম। তিনি কি মনে করেছেন?

বৌ কাদতে শুরু করলো আর বললো, তুমি মিথ্যুক। তোমার চোখে দেখেছি চোরের দৃষ্টি। তুমি চোর।

নষ্ট মেয়ের নষ্ট জীবন কাহিনী শুনে বৌকে কষ্ট দেয়ার জন্য আমার কাদতে ইচ্ছা হলো। কিন্তু আমার চোখ যে পাথরে গড়া!

বৌ বললো, কুদ্দুসভাইকে ফোন করো। জিজ্ঞাসা করবো এতো রাত পর্যন্ত কিসের কথা বললেন?

বললাম, ওনার ফোন নাম্বার জানি না।

বৌ বললো, ওনার সঙ্গে তোমার যোগাযোগ হয় কেমন করে?

বললাম, মোবাইলে।

বৌ মোবাইল নিয়ে বললো মোবাইল করো।

বললাম, মোবাইলে টাকা নেই।

বৌ আবারও ঘৃণা মিশ্রিত কণ্ঠে বললো, মিথ্যুক!

আমার বুকের ভেতর আবারও ঢঙ করে শব্দ হলো।

বৌ কাদে।

আমি বোঝাই। কিন্তু তার মন থেকে সন্দেহ আর যায় না।

মনে মনে ভাবি, এটা কি হলো? গল্প খুজতে গিয়ে বুঝি আমার বাস্তব হারিয়ে যায়।

পরের দিন সেই মেয়ে অফিসে আবার ফোন করে। বলি, আপনার কথা শুনলাম। আপনার জন্য সমবেদনা রইলো। তবে আমার সঙ্গে আর যোগাযোগ করবেন না। তাহলেই খুশি হবো। কারণ আপনার সঙ্গে কথা বলে আমার অনেক বড় ক্ষতি হয়ে গেছে।

শুনে কট করে সে ফোন রেখে দিল।

হাপ ছেড়ে বাচলাম। অফিসে আর ভালো লাগলো না। বাসায় চলে এলাম। বৌ কুদ্দুসভাইয়ের কথা আবার জিজ্ঞাসা করলো।

পাশ কাটিয়ে গেলাম। অন্য কাজে বাইরে চলে গেলাম। বিকেলে দেরি করে ঘরে ফিরলাম।

দেখলাম, কুদ্দুসভাইয়ের কাছে যাবে বলে বৌ রেডি হয়ে আছে।

অগত্যা তাকে নিয়ে বের হলাম।

বললাম, কুদ্দুস সাহেবের কাছে গিয়ে কি হবে? তার চেয়ে বরং চলো মার্কেটে যাই। একটা ভালো শাড়ি কিনে দিই তোমাকে। কতোদিন শাড়ি-টাড়ি কেনো না।

বৌ বললো, শাড়ির খেতা পুড়ি। এখনই কুদ্দুসভাইয়ের কাছে না নিয়ে গেলে সিন কৃয়েট করবো।

ভাবলাম, কুদ্দুসভাইকে হয়তো সামাল দিতে পারবো। তাই রওনা দিলাম তার অফিসে। বৌকে বললাম, তুমি নিচে দাড়াও। আমি উপর থেকে ওনাকে ডেকে নিয়ে আসি।

বৌ বললো, আমি তোমাকে কোনো সুযোগ দিতে চাই না ওনাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে আনার জন্য।

বললাম, সেখানে অফিসের লোকজন।

বৌ বললো, অফিসের লোকজনের সামনে কি করে কথা বলতে হয় সে আমি জানি।

কুদ্দুসভাই অনেক কাজের কথা বললেন। কিন্তু সব কথা আমার কানে ঢুকলো না।

আসার আগে বৌ বললো, কাল রাতে আপনি ফোন করেছিলেন বাসায়, তাই না?

কুদ্দুসভাই বললেন, কই না তো!

দেখলাম ফেসে যাচ্ছি। তাই একটু ইশারা দিয়ে বললাম, রাতে আপনার সঙ্গে কথা হলো না আমার এই কাজ নিয়ে।

নাদান কুদ্দুসভাই তখনো না বুঝে বলে ফেললেন, রাতে কোথায়? আপনার সঙ্গে তো কথা হলো বিকেলে। অবশেষে যখন তিনি বুঝলেন তখন বললেন, হতে পারে, আসলে আজকাল অনেক কথাই আমার মনে থাকে না।

বৌ আমার ততোক্ষণে মিথ্যা কতো প্রকার কি কি উদাহরণসহ সব বুঝে ফেলেছে। তবু বললো, ঠিক আছে, চলো, উঠি।

ট্যাকসিতে আসতে আসতে আমাকে বললো, সোজা বাস স্টেশনে চলো, আমাকে তুলে দেবে। না হলে সত্যি ঘটনা বলো, আমি বিবেচনা করবো তোমার অপরাধ কতোটুকু। নয়তো এমন ভাবে ফাসাবো, জেলের ঘানি টেনে কূল পাবে না।

ভয় পেয়ে গড় গড় করে সমস্ত ঘটনা বলে দিলাম।

বৌ বুক ভাসিয়ে কাদলো। বললো, আমার বিশ্বস্ততার এই পুরস্কার!

বৌয়ের হাতে ধরলাম, পায়ে পড়লাম। বললাম, তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আর কোনোদিন এমন ভুল করলে তখন তোমার যা ইচ্ছা হয় শাস্তি দিও।

বৌ বললো, ভালোবাসা তোমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। যখন যাকে ইচ্ছা ভালোবাসতে পারো। আমার মতো স্ত্রীদের ক্ষেত্রেই সঙ্গে জুড়ে দাও সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ।

বৌ রাধে আর কাদে। আমি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরি। আমার বুক ভেসে যায়।

কয়েকদিন পর একটু স্বাভাবিক হলে আমাকে বললো, ফোন নাম্বার দাও, কুদ্দুসভাইকে ফোন করি।

কি বলবে?

থ্যাংকস দেবো তিনি মিথ্যা বলেননি, তাই। আরো বলবো, ওনার স্ত্রী ভাগ্যবতী। ওনার মতো স্বামী তিনি পেয়েছেন। ওনার সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, ওনার ব্যক্তিত্ব খুব প্রখর, মেধা শার্প, এমন পুরুষই কামনা করে সব মেয়ে। যদিও সবার ভাগ্যে তা জোটে না।

আমার বুক ফেটে যায়। কুদ্দুসভাইয়ের প্রশংসায় জ্বলে-পুড়ে খাক হই হিংসায়। মনে মনে বলি, ফোন নাম্বার দেবো না, কোনোদিন না। আর তখনই বুঝি আমিও সেনসেটিভ, প্রতিক্রিয়াশীল।

তেজগাও, ঢাকা থেকে

নদীর জন্য

– সাকিব

আমি একজন চাকরিজীবী। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন সৈনিক। বিয়ে করেছি আজ প্রায় দুই বছর। কোনো সন্তান নেই। আর স্ত্রীকে আদর করে নদী বলে ডাকি।

গত কোরবানির ঈদের আগে দশ দিনের ছুটিতে শ্বশুরবাড়ি যাবো। বৌ সেখানে। যাবার আগে মোবাইল করে জানালাম ছুটিতে বাড়ি আসছি।

বৌ আসার কথা শুনে মহা খুশি।

যশোর থেকে ময়মনসিংহ যেতে যেতে রাত প্রায় দুইটা বেজে গেল।

বৌ তো আমাকে কাছে পেয়ে গলা জড়িয়ে ধরে আছে। তারপর বিভিন্ন প্রশ্ন করলো, যেমন কেমন আছি, কখন বাসে উঠেছি ইত্যাদি। বলার পর জিজ্ঞাসা করলো, কতো দিনের ছুটি।

বললাম, দশ দিন। তখন বৌ হিসাব করে দেখলো, ঈদের দুই দিন আগে চলে যাবো। বৌয়ের মন খারাপ হয়ে গেল।

কিন্তু বৌয়ের মন খারাপ হলেও কিছু করার নেই। সরকারি চাকরি করি।

আমি নদীকে প্রচণ্ড ভালোবাসি, যা লিখে বোঝাতে পারবো না বা লেখার ভাষা আমার জানা নেই। নদীও আমাকে প্রচণ্ড রকম ভালোবাসে। ছুটি পেলে বৌকে সারাক্ষণ জ্বালাতন করি, দুষ্টুমি করি। নদীকে ভালোবাসতে বাসতে কবে যে দশ দিন শেষ হয়ে গেল বুঝতে পারিনি। পরের দিন সকালে যশোর চলে যাবো।

ফজরের আজানের সঙ্গে সঙ্গে নদীর ঘুম ভেঙে গেল, সঙ্গে আমার। নদী ঘুম থেকে উঠে শিশুর মতো কান্না জুড়ে দিল।

কি করি, কিছু ভালো লাগছে না। অনেক চিন্তা করে নদীকে বললাম, তুমি আর কেদো না আমি তোমার সঙ্গে ঈদ করবো। তারপর যশোর যাবো, এর আগে নয়। আমার যা হওয়ার হবে।

বৌ বললো, পরে ক্যান্টনমেন্ট গেলে তোমাকে মারবে না তো!

বৌকে অভয় দিয়ে বললাম, মারবে না।

নদী তো মহা খুশি। নদীর আনন্দ দেখে আমার দুই চোখের মাঝে পানি এসে গেল।

খুব আনন্দে বৌয়ের সঙ্গে ঈদ করলাম। কিন্তু রাতে আমার ঘুম নেই। ছুটি শেষে ফিরে না যাবার জন্য শাস্তি তো পেতে হবে এতে কোনো ভুল নেই। মনে মনে আল্লাহকে স্মরণ করলাম আর নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম। তারপরও তো আমার ভালোবাসার নদীর মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছি, এ কাজ কয়জনে পারে।

কিন্তু নদীকে কোনো কিছু বুঝতে দিলাম না। শেষে যদি আমার কথা চিন্তা করে নদীর আনন্দটা মাটি হয়ে যায়! ছুটি থেকে সময় মতো ফিরে না যাবার কারণে চোদ্দ দিন সামরিক শাস্তি পেতে হয়েছিল। বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, এ জন্য আমার মনে কোনো প্রকার কষ্ট হয়নি। ভালোবাসার জন্য না হয় কিছু ত্যাগ করলাম। কয়জনে বা পারে!

ঈদের নাম শুনলে এখনো সেই ঈদের স্মৃতি মনে পড়ে। যতো দিন যায়, নদীর প্রতি আমার ভালোবাসা ততো বেড়ে চলছে।

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

বিকেলের প্রেম

– মুরাদ

আমার স্ত্রী ফিরোজা আখতার বেগম জান্নাতবাসী হওয়ার পর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবরা নতুন করে সংসার করার জন্য চাপ দিচ্ছিল। ফিরোজার স্মৃতির প্রতি অনুরাগ এবং ছেলেমেয়েদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের জন্য তাদের নিরাশ করেছি।

প্রায় তিনটি বছর কেটে গেল।

আমার বন্ধু জয়নাল আবেদীন এক ডেভেলপার ফার্মের প্রধান প্রকৌশলী। তার অফিসে প্রায়ই গিয়ে বসি।

একদিন এক ভদ্রমহিলা জয়নালের অফিসে এসে তার বোনের ফ্ল্যাটের বিষয়ে আলাপ করছিল। মহিলাটি বেশ ভদ্র, সুভাষিণী ও সুন্দরী।

ভদ্রমহিলা চলে যাওয়ার পর জয়নাল জানালো, তার নাম আফসানা আহমেদ, তার স্বামী সড়ক বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। স্বামী হারিয়ে মহিলাটি থাকে বোনের সংসারে।

অনেক কষ্টে তার মেয়ে রুমানাকে মানুষ করে বিয়ে দিয়েছে, মেয়ে ও জামাই থাকে নিউ ইয়র্কে। বোনের সংসারে থাকতে মহিলাটি স্বাচ্ছন্দ বোধ করে না, বাধ্য হয়ে থাকে।

মহিলার সঙ্গে মাঝে মধ্যে জয়নালের ওখানেই দেখা হয়, দুই একটা কথাও হয়।

একদিন মহিলা বললো, আমার একটা ছেলে থাকলে আমাকে বোনের সংসারে গলগ্রহ হয়ে থাকতে হতো না।

অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে হঠাৎ করে জয়নাল বলে বসলো, আপনারা তো দুজনই নিঃসঙ্গ, আপনারা একে অপরকে সঙ্গী করে নিলে কেমন হয়?

আমরা উভয়ে অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম এবং কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলাম।

অবশেষে উঠে চলে এলাম।

এ ঘটনার পর প্রায়ই জিয়া উদ্যানে যাই এবং লেকের পাশের বেঞ্চে বসে চিন্তামগ্ন থাকি।

একদিন একটি সিএনজি এসে আমার বরাবর থামলো এবং আফসানা নেমে এসে কোনো রকম ভূমিকা না করেই বললো, মুরাদভাই, বিশ্বাস করুন, সেদিন জয়নালভাইয়ের প্রস্তাবটির বিষয়ে আমার কোনো হাত ছিল না। হ্যা, আমি নিঃসঙ্গ, একা থাকা সম্ভব নয় বলেই বোনের সংসারে আছি। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার একজন অবলম্বন প্রয়োজন। তাই বলে আপনার ঘাড়ে চেপে বসতে চাইনি। এ কথা কটি বলে আমাকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই আফসানা সিএনজিতে চড়ে চলে গেল।

অবাক বিস্ময়ে তার যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

আফসানা চলে যাওয়ার পর মনটা অস্থির হয়ে উঠলো। বেঞ্চে বসে বসে ভাবছি, একজন অসহায় মহিলাকে এমনি করে আঘাত না দিলেও পারতাম। নিজেকে অবিবেচক মনে হলো। মন বলছে তার সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসি। কিন্তু চল্লিশ বছর ফিরোজা যে স্থান দখল করে আছে সেখানে আর কাউকে স্থান দিতে দ্বিধা হয়। এ দ্বিধাদ্বন্দ্বে মনটা অস্থির হয়ে আছে। একদিকে ভাবছি তাকে জীবন সঙ্গিনী করে ফেলি, অন্যদিকে ফিরোজাও আমার মনে ছায়া ফেলছে। সে যেন বলছে, আফসানা আমাকে ও আমার ছেলেমেয়েদের তোমার থেকে দূরে ঠেলে দেবে। তুমি আফসানার কথায় ভুলো না।

ভাবতে ভাবতে কখনো যে রাত বারোটা বেজে গেছে টের পাইনি। বাসায় ফিরে এলাম। কিন্তু রাতে আর ঘুম হলো না। একদিকে আফসানার প্রতি সৃষ্ট দুর্বলতা, অন্যদিকে ফিরোজার সাবধান বাণী, কি যে করবো সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না।

অবশেষে আমার কঠোর তপস্যায় লালিত সংযমে ফাটল ধরলো। আফসানার জন্য আমার মনটা উত্তাল হয়ে উঠলো। ভোর হতেই আমি আফসানাকে টেলিফোন করলাম এবং তাকে সেদিনই বিকেলে জিয়া উদ্যানে আসতে অনুরোধ করলাম।

প্রথমে সে রাজি হচ্ছিল না। অনেক করে বলাতে রাজি হলো। গতদিনের বসা বেঞ্চটিতে বসে আছি।

আফসানা এলো এবং আমার পাশে বসলো।

তাকে বললাম, আমি হবো তোমার অবলম্বন। তবে শর্ত হলো তুমি আমার ছেলেমেয়েদের দূরে ঠেলে দেবে না।

সে বললো, তোমার ছেলেমেয়েরা আমার রুমানার সমান মাতৃস্নেহ পাবে, কোনো তফাত করবো না, এ আমার অঙ্গীকার।

অনেক কথা হলো এবং বোঝাপড়াও হলো। আফসানার নিউ ইয়র্ক যাওয়ার প্রোগ্রাম আগেই করা ছিল। ঠিক করলাম আফসানা নিউ ইয়র্ক থেকে ফিরে এলে আমরা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পরামর্শ করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেবো।

আফসানাও তার মেয়ে রুমানার সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলে নেবে।

আফসানাকে বিদায় দিতে এয়ারপোর্টে গেলাম।

সে এক মাসের জন্য নিউ ইয়র্ক চলে গেল।

মেয়ের সঙ্গে আফসানার দিনগুলো ভালোই কাটছিল। মাঝে মধ্যে টেলিফোন করতো। একদিন সে জানালো, আমাদের পরিকল্পনা জেনে রুমানা খুশি হয়েছে। আমাদের এ পরিকল্পনা না থাকলে রুমানা আমাকে দেশে ফিরতে দিতো না।

আফসানার আমেরিকায় থাকার প্রায় এক মাস শেষ হয়ে গেল।

একদিন টেলিফোনে তার ফেরার প্রোগ্রাম জানালো এবং আমাকে এয়ারপোর্টে থাকতে অনুরোধ করলো।

দুই দিন পরই এক অচেনা মহিলার টেলিফোন পেলাম। তিনি জানালেন, রুমানারা এক বান্ধবীর বাসা থেকে ফেরার পথে তাদের গাড়ি এক মারাত্মক দুর্ঘটনায় পড়ে। রুমানার মা ঘটনাস্থলেই মারা যায় এবং রুমানা ও তার স্বামী আহত হয়ে হাসপাতালে আছে। রুমানার ইচ্ছায় তার মাকে নিউ ইয়র্কেই দাফন করা হয়েছে। মনে মনে বললাম, বিদায়, বন্ধু বিদায়।

আফসানার জন্য দুঃখ হয়, মায়াও হয়। হাতের মুঠোয় অবলম্বন পেয়েও দুঃখিনী আফসানাকে তা রেখে চলে যেতে হলো। একেই হয়তো বলে নিয়তি, ভাগ্যের নির্মম পরিহাস।

ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে

যদি বড় হতে

– মিস সারমিন

লাল,

তোমাকে নিয়ে লেখা এ আমার প্রথম সত্যিকারের চিঠি।

তুমি একটুও জানো না, আমি তোমাকে সেই ছোটবেলা থেকেই পছন্দ করি। তোমার মনে আছে, সেই যে তুমি আর আমি বাইরে থেকে ঘুরে এসে সেই স্মৃতিময় জায়গায় দাড়ানোর পর তুমি তোমার নিজের মুখে বললে সেই সুন্দর কথাটা যা আজ পর্যন্ত কেউ বলেনি। তুমি সরাসরি বলে ফেললে কতো বড় কথাটা। জানো আমার তখন কি যে ভয় করছিল কেউ শুনে ফেললো কি না। ভয়ের চেয়ে ভালো লাগাটাই ছিল বেশি। জানো লাল, আমার মন তখন কি বলেছিল। আমি তো তখন ছোট কিন্তু নিজের কাছেই নিজেকে আমার খুব বড় মনে হয়েছিল। মন বলছিল তখনই তোমাকে বিয়ে করতে। ইশ! যদি সত্যিই বড় হতাম তাহলে আজকের মতো বলতে পারতাম আমি তোমাকে খুব পছন্দ করি। খুব ভালোবাসি।

তোমার অজান্তে তোমাকে নিয়ে আমি কতো স্বপ্ন দেখি তা লিখে শেষ করা যাবে না। তোমাকে নিয়ে গাছে ঘর বাধি, ছন দিয়ে তৈরি ছোট্ট কুটিরে পরম শান্তিতে শুয়ে থাকি। খোলা ছাদে, বাড়ির উঠানে ঝড়-বৃষ্টিতে ভিজি। আমাদের নির্জন এলাকার বাড়ির পেছন দিয়ে বয়ে চলা ঝরনার নদীর কাচের মতো স্বচ্ছ পানিতে গোসল করি। দুজনে মিলে ঝিলের শাপলা তুলে এনে আমাদের ঘর সাজাই। তোমার বুকে মাথা রেখে গাছের ওপর তোলা ঘরের বারান্দায় আধা শোয়া অবস্থায় কতো যে জ্যোৎস্নায় ভিজেছি। লাল, তুমি যে এভাবে আমার স্বপ্ন ভেঙে গুড়িয়ে দেবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

তবে হ্যা, এটা সত্য, গত দুই বছর আগে তুমি বোধহয় আমার কথা জানার চেষ্টা করেছিলে। অথচ আমিই কৌশলে তা চেপে গিয়েছিলাম। তাতে অবশ্য তোমার দোষ ছিল না। কিন্তু তুমি দ্বিতীয়বার চেষ্টা করার কোনো পথই খোলা রাখলে না। সেদিন আমি বলতেও চেয়েছিলাম। সাত বছর পর দেখা, আমি তো তোমার সম্পর্কে কিছুই জানি না। হঠাৎ কিভাবে তোমার প্রশ্নের জবাব দিই বলো। আমি হ্যা বলার পর যদি শুনতাম তুমি সব ভুলে গেছো তাহলে আমার কি হতো বলতে পারো? *চোখের আড়াল হলে মনের আড়াল* বিশ্বাস করবে না, এই নয় বছরের দেখা, না দেখা মুহূর্তে একটুও মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি তোমাকে।

জানো, একমাত্র তোমার জন্যই শহরে যাই যদি মিরাকলের সাহায্যে তোমার দেখা পাই! কিন্তু বার বারই ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসি। আসার সময় মনে করি, আর আসবো না। কয়েকদিন যেতে না যেতেই মনটা আবার অস্থির

হয়ে ওঠে তোমার জন্য, তোমাকে দেখার জন্য। আমার দুই চোখ চারপাশে শুধু তোমাকে খোজে। সময় খুজতে থাকি কোনো অকেশন আসে কি না সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করা, তা শেষ হতে চায় না। কতো যে স্বপ্ন বুনি, কথা সাজাই তোমার সঙ্গে বলবো।

জানো, একদিন ফজরের আজানের সময় স্বপ্ন দেখি। তোমার আর আমার বিয়ে হয়েছে, কোনো আনন্দ-উৎসব নেই। তোমাদের বাড়ির সবাই শুধু তোমাকে নিয়ে ব্যস্ত। সবাই তোমার সঙ্গেই কথা বলে, আমি যেন তোমার বৌ নই এমন ভাব করে তাকায়। কেউ ভালো করে আমার সঙ্গে কথাও বলেনি, এমনকি তুমিও না। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। জানো, আমাদের শুতে দেয়া হয়েছিল সবার সঙ্গে এক ঘরে। আমি খুব অস্বস্তি বোধ করছিলাম। কিন্তু তোমার সেদিকে খেয়াল ছিল না। তুমি তোমার মাথার টোপর মালা খুলে ঘরের বেড়ার সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখলে। তারপর শুয়ে পড়লে। তার কিছুক্ষণ পরই আজানের শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়।

জানো, আমার তখন মনে হয়েছিল, না, আমি তোমাকে এভাবে এতো অগোছালোভাবে চাইনি। আর আমার এখন মনে হচ্ছে, স্বপ্নটা আমাকে সত্যি কথাটাই আগে ভাগে জানিয়ে দিয়েছিল, আমার স্বপ্ন মিথ্যা। কারণ তোমার-আমার সম্পর্ক হওয়া কঠিন। কেউ এটা মেনে নেবে না, বিশেষ করে আমার পরিবার। সে জন্যই হয়তো তুমি আমার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করেছিলে। আজ আমার দেখা স্বপ্নটায় আমার জায়গায় আমার পরিবর্তে এক অনন্য সুন্দরী ললনা স্থান করে নিয়েছে। সর্বসম্মতি পক্ষে। জানো, সে জন্য আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, এই কষ্টের জন্য আমার চোখের এক ফোটা পানিও পড়েনি, শুধুই ছলছল করেছে। আজও করে।

লাল, আমি তো এতোক্ষণ শুধু আমার কথাই বলে গেলাম। তোমার কথা কিছুই জানলাম না। তুমি কি সত্যিই আমাকে ভুলে গেছো! কিছুই কি মনে পড়ে না আমার কথা, সেই দিনগুলোর কথা। যদি জীবনে কখনো সময়-সুযোগ পাই তাহলে জেনে নেবো। কি, তুমি তার সঠিক জবাব দেবে তো, নাকি বৌয়ের সঙ্গে মিল হওয়ার পর সব মিথ্যা বানোয়াট বলে উড়িয়ে দেবে? শুধু এটুকু জেনো, সেদিন তুমি যেন আমার বিশ্বাসটুকু ভেঙে দিও না। তাহলে আজকের থেকে বেশি কষ্ট পাবো সেদিন।

ও লাল, আরেকটি কথা, তোমাকে তো মনে করিয়ে দেয়া হয়নি। তোমার বলা সেই অপূর্ব সুন্দর কথাটা। তুমি সেদিন বলেছিলে, তোমার মতোই বলছি, *তুমি যদি বড় হতে তাহলে আমি তোমাকে বিয়ে করতাম।* আচ্ছা লাল, তুমিই বলো, আমি কি এখন যথেষ্ট বড় হইনি? কিন্তু এই যে স্কুল, কলেজ পাস করেছি, তোমার মতো করে কেউ এর একটি বর্ণও বলেনি আমাকে আজ পর্যন্ত। যদিও আমাকে এমন কথা বলার মতো গুণ বা রূপ কোনোটাই আমার নেই আমি জানি।

ইতি

তোমার অজানা অজান্তে

সিরাজগঞ্জ থেকে

সে

– শ্রাবণ

ওর সঙ্গে আমার পরিচয় কিভাবে তা না-ইবা বললাম। যেভাবে হোক না কেন, হয়েছে। আজকাল হরহামেশাই শুনি মোবাইল, ইন্টারনেটের নাম। কতোজন থাকে পূর্ব পরিচিত আবার কতোজন থাকে সদ্য পরিচিত। এভাবেই চলে সম্পর্কের গতি।

আমাদের পরিচয় সেভাবে হয়নি। তবে এটা জানি সেই পরিচয়ের সূত্রে আজ পাচ বছর ধরে ধীরে ধীরে তাকে চিনেছি, জেনেছি, বুঝেছি। মাঝে মাঝে ভাবি, কিভাবে হলো? দুই বিভাগের দুজনের মাঝে বিনা তারে সেতার কিভাবে বাজলো? আমাদের সেই সুর কে শুনলো আর কে শুনলো না, তা খোজ করিনি।

একে অপরের মাঝে ভালোবাসার পূর্ণতা পেয়েছি। তাকে কিভাবে ভালোবেসেছি তা জানি না। তবে প্রচণ্ডভাবে দুজন দুজনকে ভালোবাসি। মাঝে মাঝে মনে হয় তার সব কিছু মেকি। তার উদাসীন চরিত্র এর জন্য দায়ী। প্রায়ই অনেক কিছু ভুলে যায়।

একদিন বলেছিলাম, সব যখন ভুলে যাও তখন বৌকে ভুলবে কবে?

এক গাল হেসে বললো, পৃথিবী ভোলা যায়, বৌকে ভোলা যায়!

এই মানুষটাকে নিয়ে আমার যতো জ্বালা। যদি বলি পশ্চিমে যাও, তো পূর্বে গিয়ে বসে থাকবে। যদি বলি এটা করো, দেখা যাবে তা বেমালুম গিলে বসে আছে। মাঝে মধ্যে হজম করে ফেলে – মানে কি বলেছিলাম তা–ই ভুলে যায়।

তবুও ওকে নিয়েই আছি থাকবো সারা জীবন, থাকতে চাই। না পারি তো কাটাবো আজীবন একা। এ মানুষটাই একদিন আমাকে বলেছিল, যদি ভালোবাসো তবে পাচ তলার ছাদ থেকে লাফ দাও।

শুধু বলেছিলাম, *সোনার চাদ, পিতলা ঘুঘু,* আমি লাফ দিয়ে মরি তো ভালো। না মরে যদি ল্যাংড়া হয়ে থাকি তাহলে তো দেখবো আমার সামনে দিয়ে ঢ্যাং ঢ্যাং করে অন্য আরেকজনকে নিয়ে টাংকি মারতে যাচ্ছ। তা হবে না। মরলে এক সঙ্গে মরবো। আমি মরবো, আপনি সুখ করবেন, সেটা হবে না। সবখানে আহ্লাদ খাটে তো বরিশালের মেয়েদের কাছে খাটে না।

শুনে সে হেসেছিল। বললো, কোনোদিন কি পারবো তোমাকে ছাড়া থাকতে? তামাশাও কি বোঝো না?

তবে তার কোনটা তামাশা আর কোনটা হতাশা সেটা বোঝা দায়। আমি তাকে বিশ্বাস করি। এ বিশ্বাস নিয়ে দেড় দুইশ মাইল দূরে থাকি। ভরসা শুধু গ্রামীণফোন। দূরে থাকলেও আমার স্বপ্নে ও, ওর স্বপ্নে আমি মিশে আছি। জানি না এর পরিণতি কি হবে?

স্বপ্ন দেখছি ছোট্ট একটা ঘর ভালোবাসায় ভরপুর, ফুটফুটে জ্যোৎস্নার দাপাদাপি, অসংখ্য স্বপ্ন ভরা ক্ষণ, হে খোদা করুণাময়, তাকে ছাড়া থাকা তো হবে না। রক্ষা করো।

অনার্স ফাইনাল পরীক্ষার পর হঠাৎ করে ঢাকা যাওয়া আর একটা ফার্মে চাকরি পাওয়া একমাত্র তাকে পাবার জন্য।

আমি থাকতাম মালিবাগ এলাকায়, সে থাকতো ঢাকা ইউনিভার্সিটির জসীম–উদদীন হলে। প্রায়ই অফিসের শেষে সন্ধ্যার দিকে তার হলে যেতাম। বসতাম কলা ভবনের আশপাশে। প্রায়ই বসতাম কলাভবনের পাশের Campus shadow/Car shadow–র ওখানে।

একদিন আমি আর সে বসা ছিলাম। অফিসে প্রায়ই শাড়ি পরতাম। তাই সেদিনও শাড়ি পরা ছিলাম। এমন সময় তার এক বন্ধুকে ডেকে পরিচয় করালো তোর ভাবী বলে।

লম্বা সালাম দিল সে। জিজ্ঞাসা করলো, কবে বিয়ে করেছিস।

ফাজিলটা উত্তর দিল, এই তো কয়েক মাস।

বন্ধুটি বললো, এখন তাহলে নতুন সংসারের প্ল্যান করছিস। বেশ তো। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে হেসে বললো, দোস্ত, তোর বৌটা বেশ সুন্দরী।

সে চলে যাওয়ার পর শুনলাম তার নাকি খুব আফসোস। কোনো মেয়েই নাকি তাকে পছন্দ করে না। এ জন্য আমরা বিয়ে করে ফেলেছি এ কথা ওই বন্ধুটি সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিল, এমনকি তার ভাইয়ের কানে পর্যন্ত গিয়েছিল।

তবে রটনা ঘটনাতে মোড় নেয়নি।

যাহোক, এরপর যখনই তার সঙ্গে দেখা হতো তখনই সে লম্বা সালাম দিয়ে করুণ চোখে তাকিয়ে বলতো, ভাবী, কেমন আছেন?

ওর ওই বন্ধুটির কথার কারণে আমাদের অতি পরিচিতজনেরাও আমাদের বিশ্বাস করছিল না।

একজন তো রাত দুটোয় ফোন করে তাকে চাইলো।

আমি তো আহাম্মক! বলে কি?

তবে হ্যা, এ রটনাতে আমি বেশ খুশি। হোক তা রটনা, সেটা তো ঘটনাতে একদিন না একদিন রূপান্তরিত হবেই। ইনশাআল্লাহ।

বরিশাল থেকে

মরুবাসী

– রাজু

সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখছিলাম।

সূর্যের আলো চোখে এসে পড়াতে ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ ঘুরিয়ে দেখলাম আমার ইয়েমেনি সহকর্মী উসমান তখনো অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

আমি আর উসমান গত দুই মাস থেকে জেদ্দা শহরের পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে নির্জন মরুভূমিতে টিনের একচালা এই ছোট্ট ঘরটির বাসিন্দা।

চার পাচ বছর আগের কথা হবে। আব্বা সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। দেরিতে বিয়ে করা এবং আমার বড় বোন হওয়ার কারণে আমি উনিশে পা দিতে না দিতে তাকে পেনশনে চলে আসতে হলো।

দুই বছর সংসার কিছুটা ভালোই চলছিল বলা যায়। কিন্তু দুই বছর পর পেনশনের সামান্য টাকা আর রেশনে আমাদের সাতজনের সংসার টেনে নেয়া আব্বার পক্ষে বলতে গেলে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

তখন সবেমাত্র এইচএইচসি পাস করেছি। ডিগ্রি অথবা অনার্সে ভর্তি হবো ভাবছিলাম।

এক সন্ধ্যায় আব্বা আমাকে ওনার রুমে ডাকলেন, বাবা সাগর একটু কথা শুনে যা তো।

ওনার রুমে গেলাম।

আব্বা কি যেন বলতে চাচ্ছেন। কিন্তু মনে হলো কথাটা বলতে ওনার মন সায় দিচ্ছে না। আমতা আমতা করছিলেন। তারপর কিছুটা সময় নিয়ে বললেন, পাশের গ্রামের একজন লোক সউদি আরবের একটা ভিসা বিক্রি করতে চায়। লোকটা বিশ্বাসী, তাই ভাবছিলাম ভিসাটা কিনি। তোর যদি কোনো আপত্তি না থাকে তাহলে **...**।

সাংসারিক টানাপোড়েনের কথা ভেবে উত্তর দিলাম, যেটা আপনি ভালো মনে করেন।

পরদিন আব্বা ভিসার ফটোকপি আনলেন।

জেলা সদরে অনুবাদ করাতে গেলাম। অনুবাদক ভিসা দেখে বললেন, *হাভাতি* ভিসা। পেশার নাম শুনে হঠাৎ থমকে গেলাম। ভদ্রলোক পুনরোক্তি করলেন হাভাতি মানে ভাতের অভাবী নয়। এই আরবি শব্দের অর্থ হচ্ছে *ফিশারম্যান*।

সম্ভবত জেলে ভিসা শুনে আমার খারাপ লাগবে ভেবে তিনি কিছুটা ঘুরিয়ে বললেন।

ভিসা বিক্রয়কারীর কাছে ফেরত গেলাম।

বিক্রয়কারী বললেন, পেশা যাই হোক, ওখানে যাওয়ার পর মালিক অন্য কাজ দেবে। আশ্বস্ত হয়ে মাস খানেকের মধ্যে সকল আনুষ্ঠানিকতা সেরে দুই চোখ ভরা আশা নিয়ে প্রবাসে পাড়ি দিলাম।

জেদ্দা এয়ারপোর্টে আমার কফিল (যার হয়ে চাকরি করবো) আমাকে এগিয়ে নিতে এলো।

সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম *কাইফা হালুকা* (কেমন আছেন)? তিনি কিছু না বলে আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যার অর্থ এ শব্দ তার জীবনে প্রথম শুনলেন।

দেশ থেকে শিখে আসা একমাত্র আরবি শব্দটা যখন কাজে লাগলো না তখন কিছুটা আশাহত হলাম।

পনের দিন পর কাজে যোগ দেয়ার ডাক পড়লো। আমার মালিক মূলত মাছ ব্যবসায়ী। তার কিছু লোক লোহিত সাগরে মাছ ধরে আর কিছু লোক তা শুকিয়ে শুটকি করে।

আমি দ্বিতীয় দলের শ্রমিক হলাম। এখানে মাছ শুকানো হয় লোকালয় থেকে অনেক দূরে যেন পরিবেশ দূষণ না হয়। যেখানে মাছ শুকানো হয় তার নাম *হোস*। পাথর এবং কাঠের ফ্রেমে নাইলন সুতা টানা প্রক্রিয়াকরণ এলাকাকে বলা হয় হোস। পিকআপ ভ্যানে আমরা দুজন কর্মচারী, কিছু শুকনো খাবার, সাধারণ কাজে ব্যবহারের জন্য এক ড্রাম পানি, সঙ্গে বড় তিনটি ওয়াটার ডিসপেনসার (স্থানীয় নাম *তাললাজা*) সহ এগিয়ে চলছে আমাদের ড্রাইভার।

ঘণ্টা খানেক পর হোস নামের যে স্থানে নামলাম সেখান থেকে এদিক–ওদিক চোখ রাখলাম। চারপাশে গরম তাওয়ার ওপর যেমন রঙহীন শিখা ওঠে সে রকম বাষ্প উড়ে যাচ্ছে। দূরে ছোট দুই একটা ঝোপ ছাড়া অন্য কিছু নজরে এলো না। হঠাৎ একটু হাওয়া লাগলো গায়ে। লাফ দিয়ে উঠলাম। হাওয়া যেন আগুনের গোলার মতো চামড়া পশম ঝলসে দিয়ে গেল।

জিনিসপত্র নিয়ে ঘরে ঢুকলাম। ঘরের গরমে যেন তন্দুরি হয়ে যাচ্ছিলাম। জলদি বেরিয়ে এলাম। খোলা আকাশের নিচে পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা তার চেয়ে অধিক সহনীয় বোধ হলো।

ড্রাইভার বিদায় হলো। পরিণতি ভেবে নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না। দুই চোখ জুড়ে কান্নার ঝড় উঠলো। হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রণা সশব্দে বেরিয়ে এলো অশ্রু হয়ে চোখের নদীতে। উসমান আরবিতে আমাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিল। তার ভাষার কিছুই বুঝলাম না। বুঝতে চেষ্টা করলাম না। নিরস্ত হয়ে সেও দুফোটা অশ্রু ঝরালো।

রাতে সিদ্ধান্ত নিলাম দেশে ফেরত আসবো। কিন্তু যাতায়াতের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় তিন দিন পর্যন্ত আমাদের খাদ্য সরবরাহকারী গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এই তিন দিনের চেষ্টায় উসমান আমাকে হাত–পা নেড়ে, মুখ বাকিয়ে, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে যেটুকু বোঝাতে সক্ষম হলো তা হচ্ছে – ধৈর্য ধরো, কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করো, বাবা–মাকে বিপদে ফেলো না।

আমার মনের আয়নায় তখন ভিসা ক্রয়ে ঋণগ্রস্ত অসহায় বাবার মুখ ভেসে উঠলো। পাশাপাশি মা আর অন্য ভাইবোনদের করুণ চাহনির কাছে হার মানলাম। প্রচণ্ড তাপমাত্রার ছায়াহীন মরুতে জীবনের ঘানি কাধে জুড়লাম।

সন্ধ্যায় একটা বোতল থেকে উসমান আমাদের একচালার চারপাশে কার্বলিক এসিড ছিটালো। বোতলের গায়ে নাম দেখে বুঝতে বাকি রইলো না দিনের তাপের মতো রাতে সাপের চরম ভয় নিয়েই কাটাতে হবে।

কয়েক মাসের মধ্যে আস্তে আস্তে এই বৈরী আবহাওয়ায় নিজেকে মানিয়ে নিলাম। কিন্তু মা–বাবাকে ক্ষুণাক্ষরেও জানতে দিইনি আমার করুণ অবস্থা।

আম্মা বার বার চিঠিতে লিখছেন, বাবা, তোর সমবয়সী বন্ধুরা আমার চোখের সামনে এখনো আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছে, পড়তে যাচ্ছে, কৃকেট খেলছে। অথচ আমি কেমন পাষাণ মা যে কি না এতোটুকু বয়সে তোকে বাইরে কাজে পাঠালাম? বাবা তোকে বড্ড দেখতে ইচ্ছা করে। তোর একটা ছবি দিস।

নানান অজুহাত দেখিয়ে মাকে ছবি পাঠাচ্ছি না। জানি মা আমার রোদে পোড়া তামাটে চেহারা আর হাড্ডিসার দেহটা দেখে নিজেকে সামলাতে পারবেন না। এমনিতে তিনি প্রেশারের রোগী।

আজ প্রায় তিন বছর পূর্ণ হতে চললো স্বজন ছাড়া এই প্রবাস জীবনের। প্রতি দফায় আমাকে দুই তিন মাসের জন্য নির্জন মরুবাসী হতে হয়। মাঝের কিছুদিন লোকালয়ে এসে কফিলের *চুক আল ছামাক* (মাছ বাজার)–এ কাজ করতে হয়।

এখন ভালো আরবি বলতে পারি।

যতোই দিন যাচ্ছে, ইদানীং ক্রমেই বাড়ির কথা, আত্মীয়পরিজনের কথা বেশি মনে পড়ছে। বিশেষ করে পড়শি সুবর্ণাকে দেখার জন্য যেন উদগ্রীব হয়ে পড়েছি। কলেজের ফার্স্ট ইয়ার থেকেই আমি ওর প্রতি দুর্বল। ও আমার দুই বছরের জুনিয়র। কিন্তু এখন সে আমাকে ডিঙিয়ে গেছে। কেমিস্ট্রিতে অনার্স করছে শুনেছি। তাকে

নিয়ে স্বপ্ন দেখা অর্থহীন জানি, তবুও দুদণ্ড অবসর পেলেই তাকে নিয়ে ভাবতে ভালো লাগে। হয়তো ও এসব শুনলে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসবে।

গতকাল এখানে ঈদ ছিল। আজ বাংলাদেশে ঈদুল ফিতর উদযাপিত হচ্ছে। শেষ রাতের স্বপ্নটা আমার ভেতরটায় মহা এক জলোচ্ছ্বাস জাগিয়ে দিয়েছে। দেখলাম মা আমাকে নিজ হাতে সেমাই খাওয়াচ্ছেন। পুরনো দিনগুলো সিনেমার পর্দার মতো হৃদয়পটে ভেসে উঠলো। ঈদের সকালে দল বেধে মসজিদে যাওয়া, এবাড়ি–ওবাড়ি আর এঘর–ওঘরে ছোটাছুটি, আহ! কতো না আনন্দের ছিল সেই সব দিন।

নানান প্রতিকূলতায় গত তিনটি রমজানের ঈদে এক চামচ সেমাই খাওয়া হয়নি আমার। একাকীত্বে শূন্য মনটা হাহাকার আর আর্তনাদে কাতরাচ্ছে। মা, ওমা! আমাকে একটু সেমাই খাইয়ে দেবে?

জেদ্দা থেকে

মেয়েদের বলছি

আমি সব সময়ই খুব সাধারণ একটা মেয়ে। কিন্তু আমার জীবন অসাধারণ সব চমৎকার ঘটনায় ভরা। আমার চারপাশের সব কিছু নিয়ে অসম্ভব সুখী ছিলাম ছোটবেলা থেকেই। বেশ ভালো একটা পরিবারে জন্ম আমার। ধনী না হলেও অসচ্ছল নই আমরা কিছুতেই। তবে তারচেয়েও বলার মতো যা, তা হলো আমাদের পরিবার একটি শিক্ষিত এবং রুচিশীল পরিবার।

ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছি অবাধ স্বাধীনতার মাঝে। কখনোই এমন কোনো পরিস্থিতিতে পড়িনি যখন আমাকে ভাবতে হয়েছে, না, এই কাজটা করা যাবে না কারণ আমি একজন মেয়ে।

ছোটবেলা থেকেই আমার স্বপ্নগুলো ছিল আমার নিজের মতো। খুব বেশি মেয়েলি বলবো না। কারণ আমি ঘর–সংসার নিয়ে স্বপ্ন খুব কমই দেখেছি।

পড়াশোনা করছি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজি বিভাগে। এখানে পড়তে গিয়ে সবচেয়ে বেশি যা অনুভব করেছি তা হলো অনেক ছাত্রছাত্রীই সঠিক ম্যানার্স জানে না। এই জায়গায় বেসরকারি ইউনিভার্সিটিগুলো এগিয়ে আছে। অন্তত তাদের ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি স্মার্ট।

নিজেকে একজন সচেতন এবং স্মার্ট মেয়ে বলেই জানতাম। কিন্তু চাকরি জীবনে ঢোকার পরই হঠাৎ আমার কাছে স্মার্টনেসের সংজ্ঞাটা আমূল পালটে গেল। সমাজের উচু মহলের মানুষদের বিভিন্ন রূপ দেখতে দেখতে অবাক হয়ে চিন্তা করি, এরই নাম কি স্মার্টনেস?

ছোটবেলা থেকেই ছেলেদের সঙ্গে মিশি। এখনো আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা ছেলেই। এতেই আমার ধারণা হয়েছিল, ছেলেদের ভালোই চিনি। কি মহা বোকা আমি! দিনে তিনবার গাড়ি বদলানো পুরুষদের দেখে বুঝেছি পুরুষদের কাছে মেয়ে মানে প্রথমেই একটা শরীর। তারপর অ্যাডজাস্ট করে সম্পর্কটাকে একটা নাম দিয়ে দিলেই হলো।

একবার একজনকে জিজ্ঞাসা করেছি, আচ্ছা, সব কিছু কি তাহলে এতো ফিজিকাল।

সে অবাক হয়ে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেছে, মেয়ে, তুমি কি আসলেই এতো বোকা? ফিজিকাল আর মেনটাল বলে আবার কোনো ভাগ আছে নাকি?

দেখতে বোধহয় খারাপ না। তাই তো এতোবার করে লাঞ্চে যাওয়ার নিমন্ত্রণ পাই। আশপাশের মানুষদের বোঝাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে, দেখতে যতো স্মার্ট, মানসিকভাবে আসলে এতোটা হতে পারিনি।

এখনো বাইরে তেমন কিছু করতে পারি না। ফলে বাসায় রাতে আমার ঘুম আসে না। এখনো কেউ কাজের ছলে খুব কাছ ঘেষে বসলে স্বাভাবিকভাবে হাসতে পারি না। অথচ কি আজব, সারা দিন আমার ছেলে বন্ধুদের হাত ধরে ঘুরেছি। ক্লান্ত হয়ে গেলে তাদের গায়ে হেলান দিয়ে রেস্টও নিয়েছি। কই? কখনো তো আমার অস্বস্তি লাগেনি!

মেয়েদের যে আসলেই একটা কিছু অনুভূতি থাকে তা আগে বুঝিনি। এখন বুঝি। কে যে আমার দিকে তাকিয়ে কি ভাবছে তা বোঝার মতো অভিজ্ঞতা আমার আস্তে আস্তে হয়েই যাচ্ছে। পা পিছলে পড়ে যাওয়াটা এতো সহজ! এগুলো তো আমার অভিজ্ঞতারই অংশ। বলছি না যারা নানান রকম রিলেশন মেইনটেন করে তারা খারাপ। কোন সাহসে এই কথা বলবো?

কিন্তু ঠিক ও রকম হতে চাই না। এখনো চাই এমন একজন বৌ হতে যে বাসায় আসার পর তার বর ভ্রূ কুচকে তাকাবে না, যার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হবে সারা দিন অফিস শেষে ওই বাড়ি ফিরে যাওয়াটাই।

আমার এই লেখটা কিছু মেয়েদের পরামর্শ দেয়ার জন্য। এতো রকম মানুষ দেখেও নিজেকে ঠিকই সামলে নিতে পেরেছি বা নেয়ার চেষ্টা করছি। এমন না যে যেসব মানুষ আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছে তারা হ্যান্ডসাম না বা টাকা-পয়সা, চাকচিক্য নেই। আমি কিভাবে পারলাম? আমি চেষ্টা করেছি লজিক ঠিক রেখে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে যা সব সময় আমার জন্য সহজ ছিল না। যেসব মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে মেশেন না তাদের জন্য এটা আসলেই আরো অনেক বেশি কঠিন।

মেয়েদের বলছি, পৃথিবী রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের উপন্যাস না। আপনি কারো সঙ্গে সম্পর্কে যেতে চান, ভালো কথা। কিন্তু ভেবে দেখবেন, যেদিন এই সম্পর্কটা ক্লিন ব্রেক হবে অথবা পেন্সিলের মতো ভেঙে যাবে, আপনি সেটা হাসিমুখে মেনে নিতে পারবেন তো? যদি কিছু ফান বা মজা চান তাহলে খুবই ভালো। এগিয়ে যান, কিছু ফান করুন এবং তারপর ভুলে যান।

কিন্তু যারা আমার মতো নিজের জীবন চান ঝামেলাহীন এবং নির্মল আনন্দের তাদের বলছি, ঠাণ্ডা মাথায় ভাবুন। হলেনই বা আপনি বিশ্ব সুন্দরী। কিন্তু আপনিই কি প্রথম যাকে চাকচিক্যপূর্ণ পুরুষটি প্রেম নিবেদন করছে অথবা আপনিই কি শেষ?

আরেকটা কথা, কাউকে যদি সত্যিই ভালো লাগে তাহলে তার সঙ্গে মিশুন। আপনি যদি মেশেন তাহলেই কেবল বুঝবেন মানুষটা ভালো না মন্দ। ইনফ্যাচুয়েশন আস্তে আস্তে কেটে যাবে।

চরম বোকা ধরনের চিন্তা হলো, ভালো লাগলো কিন্তু মিশবো না যদি প্রেমে পড়ে যাই! বরং না মিশলেই প্রেমটা মনে থেকে যায়, মনে হয়, ইশ না জানি কি মিস করলাম। পৃথিবীটাকে ফেস করুন এবং অবশ্যই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। আপনার চেয়ে চমৎকার আর কে আছে দুনিয়ায়!

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

my_realization@yahoo.com

শোলাকিয়ায়

– আবদুর রহমান

ছোট থেকেই খুব ইচ্ছা ছিল আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় ঈদগাহে নামাজ পড়ার। কিন্তু তখনো জানতাম না দেশের বড় ঈদগাহ কোথায়।

যখন একটু বড় হলাম তখন জানতে পারলাম দেশের বড় ঈদগাহ হলো কিশোরগঞ্জ জেলায়। আমার জন্য সমস্যা ছিল ওখানে যাওয়া নিয়ে। কেননা আমার বাড়ি চট্টগ্রাম জেলায় আর শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দান কিশোরগঞ্জ জেলায়। বুঝতেই পারছেন দুরত্ব কতো? তারপরেও যাওয়ার খুব ইচ্ছা।

এরপর ২০০২ সালের রমজান মাসে তাবলিগ জামায়াতের সঙ্গে ময়মনসিংহ জেলার গফরগাও থানায় গেলাম। ওখানেই আমাদের ঈদ করতে হবে। আস্তে আস্তে ঈদ অতি কাছে এসে গেল।

ঈদের ঠিক আগের দিন আমাদের জামায়াতের সামসুল করিমভাই বললেন, এখান থেকে শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দান খুবই কাছে। আমরা চাইলে সেখানে ঈদের নামাজ পড়তে পারি।

ওনার কথা শুনে হাতে চাদ পাওয়ার মতো খুশি হলাম। তাকে বললাম, চলেন তাহলে সেখানে ঈদের নামাজ পড়ি।

তিনি যাওয়ার জন্য রাজি হলেন।

আমাদের জামায়াতে নারায়ণগঞ্জের তাওহিদুল ইসলাম শিশিরভাইয়ের সঙ্গে আমার খুবই ভাব ছিল। তাকেও শোলাকিয়া যাওয়ার জন্য রাজি করালাম। আরো কয়েকজন যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমরা দল আর বড় করিনি।

আমরা তখন মনে হয় গফরগাওয়ের ঝাউয়াইল নামের এলাকায় ছিলাম। ওই এলাকার একজনের কাছ থেকে আমরা জেনে নিলাম কিভাবে শোলাকিয়ায় যেতে হয়।

ঈদের দিন ফজরের নামাজের আগেই গোসল সেরে নিলাম। ফজরের নামাজের পর যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম আমরা তিনজন। ঈদের নামাজের জামাত হবে সকাল নয়টায়। এ জন্য আমরা যাত্রা শুরু করলাম সকাল সাতটার আগেই।

প্রথমেই নৌকা দিয়ে নদী পার হলাম। এরপর নদীর পাড় হয়ে হোসেনপুর পর্যন্ত হেটে গেলাম। হোসেনপুর থেকে টেম্পোযোগে আমরা শোলাকিয়াতে পৌছালাম।

সেখানে গিয়েই প্রথমে সকালের নাশতা করে নিলাম। এরপর ঈদগাহ ময়দানের আশপাশে একটু ঘুরে ফিরে দেখলাম। তারপর নামাজ পড়ার জন্য নামাজের কাতারে বসে গেলাম।

আমরা চার বা পাচ নাম্বার কাতারে ছিলাম, মাঠের দক্ষিণ-পশ্চিম কর্নারে। আমাদের মাথার ওপর ছিল বিশাল এক শিশু গাছ।

এখনো ঈদের সময় টেলিভিশনে সেই শিশু গাছ দেখালে অনুমান করে বলতে পারি আমরা কোন জায়গায় নামাজ আদায় করেছিলাম।

সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম থেকে

ঋণী

– নীলিমা সেন

স্বামীর ডিভি লটারি পাওয়ার সূত্রে একমাত্র সন্তান তিন বছরের মেয়ে পিংকিকে কোলে নিয়ে বাংলাদেশ বিমান যোগে নিউ ইয়র্ক এসে পৌছি।

এয়ারপোর্টে স্বামীর বন্ধু সুজন এসেছিল তার ইয়েলো ক্যাব নিয়ে। অত্যন্ত স্মার্ট এবং অনর্গল ইংরেজি বলাতে তার দক্ষতা আমাকে প্রথম দর্শনে মোহিত করে। আমার হাতের বোঝা নিজের হাতে তুলে নিয়ে সুজন আমাকে ভারমুক্ত করে।

জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে ছুটে চলে গাড়ি। সুজন ড্রাইভিং সিটে বসে অত্যন্ত দক্ষ হাতে গাড়ি চালাচ্ছে। মাঝে মধ্যে লুকিং গ্লাসে বৌদিকে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছে।

ঘণ্টা খানেক চলার পরে আমরা গন্তব্যে এসে পৌছি নিউ ইয়র্ক সিটির ব্রংকস এলাকায়।

পলাশ আপাতত চাকরি পাওয়া পর্যন্ত সুজনের বাসায় থাকার প্ল্যান করলো।

জানতে পারলাম সুজন অবিবাহিত, নিউ ইয়র্কে আছে বছর পাচেক হলো। সুজন তার অমায়িক ব্যবহার, যেচে পড়ে সাহায্য করার মাধ্যমে অল্প কয়েকদিনেই আমাদের আপন করে নিল। এই বিদেশ-বিভূইয়ে সে ছাড়া আমাদের আপন বলতে কেউ নেই। তাই আমরাও তাকে আপন করে নিলাম। মনে মনে ঠিক করলাম পলাশের ভালো একটা চকির হয়ে গেলে অন্য বাসায় চলে যাওয়া যাবে। আপাতত দুই কামরার বাসায় শেয়ার করে থাকতে হবে।

সে আমাদের জন্য তার বেডরুম ছেড়ে দিয়ে ড্রয়িংরুমের সোফা বেডে বিছানা পাতলো।

উপায়ান্তর না দেখে কিছু বলতেও পারিনি। সুজন নাইট শিফটে ট্যাকসি চালায়। ভোরে এসে সোফাতে সটান শুয়ে পড়ে। দুপুরে উঠে লাঞ্চ করে।

পলাশ ইতিমধ্যে চাকরির খোজে বের হয়। সারা দিন বাইরে কাটিয়ে সন্ধ্যায় বাসায় ফেরে।

পলাশ বাসায় ফিরলে সুজন আমাদের শহর দেখাতে নিয়ে যায়।

এভাবে বেশ ভালো ভাবে চলছিল।

প্রায় সময় সুজন আমাকে ঘরের কাজে সাহায্য করে। এটা ওটা কুটে দেয়, ধুয়ে দেয়। আমি আসাতে সে রান্নার ধকল থেকে বাচে। প্রায় মাস ছয়েক আমাদের ডলারগুলো বাক্সেই বন্দি হয়ে রইলো। বাসার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই সে কিনে আমাদের দুজনকে এক রকম কৃতজ্ঞতার পাশে বেধে ফেলেছে। ঋণের বোঝাটা কিছুটা হলেও হালকা করার জন্য উপায় খুজতে থাকলাম।

অবসর সময়ে তাকে সঙ্গ দেয়ার চেষ্টা করলাম।

কিছুতেই সে উপহার নেবে না।

অগত্যা তাকে নিয়ে এখানে ওখানে ঘুরে কাটালাম। দিন দিন তার মায়াবী আকর্ষণে নিজেকে সমর্পণ করলাম। একদিন পার্কে নির্জনে বসে তাকে জানালাম তাকে আমার ভালো লাগে।

সে হাতে চুমু দিয়ে প্রতিউত্তর দিল।

এদিকে স্বামীও তার একচেটিয়া উপকারের কারণে আমাদের মেলামেশাকে নীরব সম্মতি জানালো। মাঝে মধ্যে আমাদের গল্প করার সুযোগ দিয়ে পলাশ বাইরে চলে যেতো।

এরই ফাকে একদিন সোফাতে বসে তাকে আদর করতে চাইলাম।

অতিরিক্ত লাজুক হওয়ার কারণে সে ফৃ হতে পারছিল না।

তাকে সাহস দিলাম।

বৌদির প্রেমে মজে গেল সুজন। এক মুহূর্ত সে আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না। সারাক্ষণ পিছে পিছে ঘুর ঘুর করে। যে কোনো বিষয়ে তর্ক করে ও অভিমান করে।

মনে মনে স্বামী আমার ভীষণ খুশি।

একদিন উইকএন্ডে নিউ জার্সিতে বেড়াতে গেলাম।

আটলান্টিক সিটিতে গিয়ে জুয়া খেলে সুজন প্রচুর ডলার পেল। আসার সময় ডলারগুলো আমাকে গিফট দিল। এতে আমার চেয়েও পলাশ ভীষণ খুশি হলো।

ভাবলাম সুজন কি তবে অন্য কিছু চায়? কিন্তু হাবভাবে তা মনে হয় না।

এক রবিবার ছুটির দিন। আমরা কোনি আইল্যান্ড-এ বেড়াতে গেলাম। বেলাভূমিতে বিনোদনের মহা আয়োজন। বিভিন্ন রাইডে চড়ে চড়ে ক্লান্ত হয়ে গেলাম। অতঃপর গেলাম ভূতের ঘর দেখতে। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। এই ফাকে তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করলাম।

পনেরো মিনিট ধরে সে তার বৌদিকে প্রতিউত্তর দিল।

বাইরে পলাশ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সুজনের ধরা পড়ে যাওয়া মুখচোরা ভাব লক্ষ্য করে পলাশ বলেই ফেললো, Take it easy, টেক ইট ইজি।

এরপর ও অনেকটা ফৃ হতে চেষ্টা করলো। তারপর থেকে সে প্রতিদিন ডিউটি শেষ হওয়ার আগেই শেষ রাতে ফিরতে লাগলো।

কলিংবেলের শব্দ শুনে দরজা খুলে দেখি অভিমান করে দাড়িয়ে আছে সুজন।

অগত্যা হাসি মুখে তাকে বরণ করে সোফাতে বসিয়ে আদরে আদরে ভরিয়ে দিলাম। বুঝতাম এ জন্যই তার কাজে ফাকি দিয়ে ঘরে ফেরা।

এরপর থেকে প্রতিদিন তাকে সোফাতে শুইয়ে ঘুম পাড়াতে হতো। হাতের বাধন আলগা করে মাঝে মধ্যে পাশের রুমে গিয়ে পলাশের বুকে মুখ লুকাতাম।

একবার ব্রংকস জু-তে কড়া রোদের মধ্যে কাটালাম সারা দিন। সন্ধ্যায় ঘরে ফেরার পরে প্রচণ্ড মাথা ব্যথা শুরু হলো।

পলাশ রান্নার দায়িত্ব নিল।

সুজন ঝুমাকে ঘুম পাড়িয়ে আমার সেবায় নিয়োজিত হলো। সে আমার শারীরিক অসুস্থতার কারণে অস্থিরতা বোধ করতে লাগলো।

মাথার যন্ত্রণায় অনন্য উপায় হয়ে তাকে পাশে শুইয়ে জড়িয়ে ধরে স্বস্তি খুজতে চেষ্টা করলাম।

সে উঠে রান্না ঘরে গিয়ে খুব গরম এক কাপ কফি এনে আমার মুখে ধরলো।

তার মমতায় বিগলিত হয়ে আমার চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়লে সে আমায় আদরে আদরে ভরিয়ে দেয়। প্রচণ্ড আবেগে অধরে অধর নিস্পেষিত হতে থাকে।

তারপর আমার আর কিছুই মনে নেই। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে শুনলাম গত রাতে সুজন ডিউটিতে যায়নি। তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে গেল।

একদিন শেষ রাতে সুজন ডিউটি থেকে ঢুলে ঢুলে এসে দরজার ওপাশে দাড়ায়। বুঝতে পারলাম নেশা করেছে। দূরে থাকতে চাইলাম। কিন্তু পারলাম না।

সে আমাকে পাজাকোলা করে সোফাতে নিয়ে গেল। মৌচাকে বুঝি মৌমাছির হুল ফোটানো শুরু হলো। নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম।

সকালে উঠে সে অত্যন্ত লজ্জিত কণ্ঠে ক্ষমা চেয়ে নিল।

এভাবেই চলছিল দুই বছরের সমঝোতা ভিত্তিক ত্রিভুজ প্রেম। আমি একজন নারী হয়ে একদিকে নিজের সংসার সামলাতাম, অন্যদিকে তাদের দুজনের প্রাপ্যও যথাসাধ্য মেটাতাম।

পলাশের ভালো চাকরির অফার আসাতে আমরা কানাডাতে পাড়ি জমালাম। নিউ ইয়র্কে রেখে এলাম একজন সরল প্রকৃতির ভালোবাসার মানুষকে।

আজও মাঝে মধ্যে মনে হয়, এমন মানুষ খুব কমই পাওয়া যায় যে আত্মনিয়ন্ত্রিত পুরুষ, পরিপূর্ণ যৌবনের এই ক্ষণেও নারী সম্ভোগের জন্য লালায়িত নয়।

পূর্ণ ঠিকানা বিহীন

তালা চাকমা

– লালসাহেব

চেলাম চাব। মুই কানত ধরেলাম। আর ন'খামু। এবারে ন'খামু। খেলে তুই বেচি করে মারিবে। টলতে টলতে তালা চাকমা একবার কান ধরে, একবার পা ধরে আবার দুই হাত জোড় করে মাপ চায়। বলে, এটটু বেচি অইয়ে, মাপ খরে দাও। বলতে বলতে পাহাড়ি অন্ধকার পথে হারিয়ে যায়।

প্রায় বিকেলে এ ধরনের ঘটনা ঘটে। সকালে একদম ঠিক। দেখা হলেই *নমস্কার চাব* বলে।

কখনো বাসায় এসে বিশ পচিশ টাকা চেয়ে নেয় আবার ঠিক কথা মতো দিয়ে যায়। শীতে গরমে প্রায় উদোম শরীর। বাসায় এলে তালার সঙ্গে কথা বলি, গল্প করি। জায়গা, জমি আছে কি না তা একদিন জানতে চাই। উত্তরে তালা বলে, *নেই* চাব।

কিভাবে চলো জিজ্ঞাসা করলে বলে, *মুই লাউরি কাটে, কন কন ছময় মাচ ধরে।*

চলতে কষ্ট হয় না? এমন প্রশ্ন করলে উত্তরে বলে, *খি খরিব চাব, গরিব মানুষ।*

বলি, বড় জাল কিনলে তো লেকে মাছ ধরতে পারো।

সে বলে, *না পারে চাব। মরত পইসা নেই।*

তাকে জিজ্ঞাসা করি, আজ কি খেয়েছো?

সে বলে, *উঃ চারা বাঙালী পাড়াত থন গরু আনিয়ে।*

দুই দিন সইয়ে একটা গরু মরিরে। মোরা খায়। বেচি মজা অইয়ে।

এভাবে এক সময় চা শেষ হয়, কথাও শেষ হয়। তালা নমস্কার জানিয়ে চলে যায়।

একদিন সকালে একজোড়া আনারস আর একটি কাঠাল নিয়ে তালা হাজির। তাকে জিজ্ঞাসা করি, অসময়ে এগুলো পেলে কোথায়?

উত্তরে বলে, মর *ঘরত লগে, পাইককে।*

বলি, বাজারে নিয়ে যাও, অনেক দামে বিক্রি করতে পারবে।

তালা বলে, *মুই এর নাই আনিয়ে, গাছা পেরথম ফল।*

কতো দেবো?

বলার সঙ্গে সঙ্গে তালার মুখ কালো হয়ে যায়।

দাড়িয়ে বলতে থাকে, *ভগয়ান আছে, মুই তর লাই আনিয়ে। মুই তর ঘরত আর ন আইস*।

তালার মেজাজ দেখে বলি, ঠিক আছে বসো চা খাও।

মনে হলো আমার কথায় সে খুশি হয়েছে। সন্ধ্যায় ঘরের সব রুমের বাতি জ্বলে উঠলে তালা উকি মেরে সব রুম দেখে। দেখে টুলে বসে কপালে হাত পেটাতে পেটাতে বলে, এ *বড় বাচা, কদ কিছু! বাব্বারে বাব্বা কদ চুন্দর। সুই তন বুজে বুঝিলে ইক্কুল কলেজত পড়তাম। আহহা, বলে* আবার কপালে থাপ্পড় দেয়। তারপর বিড় বিড় করতে করতে ধীরে ধীরে চলে যায়।

সাধারণত পাহাড়ি এলাকায় ঘূর্ণিঝড় তেমন সুবিধা করতে পারে না। কিন্তু এ বছর তাণ্ডবলীলা খেলে দেয়। অধিকাংশ কাচা বাড়ি ধ্বংস করে দেয়। এ ধ্বংসযজ্ঞের গুরুতর শিকার হয় তালা পরিবার। তার বাড়ি কোনদিকে তা জানি। কিন্তু কোন পথে কিভাবে যেতে হয় তা জানা ছিল না বলে খোজ নেয়া সম্ভব হয়নি। আমি ভোরে বেরিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের খোজখবর নিচ্ছি, সমবেদনা জানাচ্ছি। এ সময় তাড়াতাড়ি বাসায় যাওয়ায় তাড়া এলো। গিয়ে দেখি হামিদ নামের এক ডে লেবার মাথা কাটা অবস্থায় কাতরাচ্ছে। ডাক্তারের কাছে চিঠি লিখে লোক দিয়ে তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিই। প্রয়োজনে ওষুধ কেনার জন্য কিছু টাকাও দিই। হামিদকে পাঠাতে না পাঠাতেই তালা ও তার স্ত্রী রমলা বস্তার মতো কি একটা জিনিস বাসার সামনে রেখে ভেতরে প্রবেশ করেই দুজনে আমার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে সালাম করে করুণ সুরে বলে, *চাব মর মেয়েকে বাচাও। ময় ঘর চেচ। খুতি বেঙে মর ডাঙর মেয়েল পেটে ডুকিচে। মরা নিয়া আইয়ে। তুই বাচাও।*

মেয়ে কোথায় জিজ্ঞাসা করলে বলে, *এর ঘরত চাননে*।

আমার ঘরের সামনে।

হ্যা চাব? উত্তর দেয়।

দ্রুত গিয়ে দেখি বস্তা মোড়ানো মাটিতে মেয়ে। লোকজন ডেকে মেয়েটিকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিই।

কিন্তু ডাক্তার জানায়, আঘাত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রোগীর প্রাণ বেরিয়ে গেছে।

পরদিন তালা আসে, সঙ্গে রমলা। *বলে, মরত পোয়া নেই। এ মাইয়া পোয়াটাকে একটা চাওয়ি দিবার কইছিল। চিবা দব হাজার টেকা চাইয়ে মুই ন দিবার পারে। চাওরি অইলে ত মর মাইয়া মরিত না। বালা জাগায় মানুচ মরে না। মদের গরিব মানুচ মরে।*

তালা রমলাকে চা নাশতা দেয়া হলো। খেলো না।

দাড়িয়ে বলে *মরা ন খেইব। তুই দুঃখ নিও না, বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।*

তালা আর আসে না। কেন আসে না, কেন দেখা করে না এমন অনেক প্রশ্নে কিছু টাকা নিয়ে তালার বাড়ি আবিষ্কার করলাম। কিন্তু তালারা কোথায়? জানতে চাইলে লোকজন বলে, *ঘরব মাটিতে মরা মাইয়া পোয়াকে রাকিয়ে কোন দিগত চলি যাইয়ে। চের মাচ অইয়ে না পেরে।*

ভালোবাসার তালারা চলে যায়, ভালোবাসা পায় না বলে ভাবতে ভাবতে হাতে রুমাল উঠে আসে, গন্তব্যস্থল ঝাপসা হয়ে যায়।

পেছন থেকে কে একজন *জুবায়ের* বলে ডাক দিলে হুশ হয়।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

একদিন

কলেজে ভর্তি হবার অল্পদিন পর আমার অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া, আশ্রয়দাত্রী এবং সেই সূত্রে অভিভাবকের সঙ্গে এক বাসায় বেড়াতে গিয়ে জানা গেল ওদের সঙ্গে লতায়-পাতায় একটা আত্মীয়তার কথা। আরো জানা গেল, ওর এবং আমার, দুজনারই নামের আদ্যক্ষর এক।

ও তখন স্কুলের শেষ ধাপে। বয়সের দোষে বা গুণে প্রথম দর্শনেই ওকে ভালো লেগে গেল। আমার আত্মীয়া বেড়াতে যাবার সময় একজন সঙ্গী পেয়ে গেলেন আর আমিও এর জন্য অপেক্ষায় থাকতাম। ওর সঙ্গে কদাচিৎ কথা হতো, হতো লেখাপড়া নিয়েই। কলেজের ছাত্র বলে কথা?

সেও এসএসসি পাস করে কলেজে ভর্তি হলো। শহরে একটাই কলেজ। তবে ছাত্রীদের জন্য দেয়াল ঘেরা পৃথক জানানা মহল। ছাত্রছাত্রীদের নৈতিকতা রক্ষার দিকে কলেজ কর্তৃপক্ষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতো। তাই কলেজে কথা বলার সুযোগ ছিল না। হঠাৎ কোনোদিন চোখে চোখে ভাব বিনিময় হতে পারতো। তবে অনিয়মিত হলেও ওদের বাসায় যাতায়াত ছিল। কখনো একাকী। ওর অভিভাবকরা কি একটু প্রশ্রয় দিতেন?

আরো দুই বছর। এর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা একটু হয়েছে। ওর পরীক্ষা শেষ হলো। এক সময় আমারও। এমনি একদিনে সুযোগ বুঝে, ওকে পেতে চাইলাম।

সে ক্ষেপে গেল না, রাগও করলো না। মুখে কি রকম একটা ভাব ফুটিয়ে বললো, একটু সবুর করুন না, আমি তো আপনার জন্যই।

পাথর হয়ে গেলাম। এ কি কথা! নিজেকে সংযত করতে পারলাম পুলকিত হৃদয় নিয়ে।

কয়েক মাস পর ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যাবার প্রাক্কালে ওদের বাসায় দেখা করতে গেলাম। ওরা খুশি হলেন বলেই মনে হলো। ওরা কি আমাদের নিয়ে কিছু ভাবতে শুরু করেছিলেন?

সেও নিজেও বিএ-তে ভর্তি হয়েছে ততোদিনে। এ সময় ওর সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের সুযোগ ছিল কম। হঠাৎ একদিন একটা চিঠি পেলাম।

অপরিচিত মেয়েলি হাতে ঠিকানা লেখা। কার চিঠি? খুলে দেখি ওর।

দুঃসংবাদ।

ওর বিয়ে। বর এলএমএফ পাস করা এক ডাক্তার। ওর অভিভাবকদের বিচক্ষণতা প্রশংসার যোগ্য। এমএ পাস করলেই আমি কোনো হাতি, ঘোড়া না খাটাশ, বনবেড়াল হবো কে জানে? তারচেয়ে সদ্য পাস করা একজন ডাক্তার অবশ্যই শ্রেয়। ওর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাওয়া গেল।

দুজনই কাদলাম। এদিন সে-ই আগ্রহী হয়ে আমার ঘনিষ্ঠতা কামনা করলো।

রাজি হতে পারলাম না। রিপুতাড়িত আমি ওই একদিনই তাকে ভালোবেসেছিলাম, সত্যিকার অর্থেই, আর নিজেকে খুব বড় মনে করতে পেরেছিলাম।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

সুন্নত ও ফরজ

– তাজু

অপ্রিয় হলেও সত্যকে অস্বীকার করা ঠিক নয়। দুই এক পুরুষ চেপে রাখা গেলেও সমাজ ব্যবস্থায় তার নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ধরা পড়বেই। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি যদি আমরা বছরের পর বছর লালন করি তা থেকে কিছু মন্দের অনুপ্রবেশ ঘটবেই। এ বিষয়গুলো খুবই স্পর্শকাতর। কেননা এ দেশের বেশির ভাগ মানুষ প্রকৃত শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। এখানে ধর্মীয় নৈতিকতার তুলনায় আনুষ্ঠানিকতা বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। এ জন্য এ ধরনের বিষয় নিয়ে গল্প ফাদা উচিত নয়। কিন্তু ওই যে বললাম, সত্যকে অস্বীকার করা অন্যায়, ঘটনাটা এ জন্যই বলতে চাচ্ছি।

ঘটনাটা বছর তিনেক আগের। আমার লেখা পড়ে প্রগতিশীলরা যেন উল্লসিত হবেন না এবং প্রতিক্রিয়াশীলরাও যেন গায়ে মাখবেন না।

এ দেশের সহজ সরল মানুষের ধর্মানুভূতিতে আঘাত করার জন্য লিখছি না। মৌলবাদ বা ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ বিষয়ক যে নতুনত্ব এ পৃথিবীতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, সেই পথে হঠাৎ নেমে পড়েছি এমন ভাববেন না। স্রোতে ভাসছি বা বাজারজাত করার জন্য বিজ্ঞাপনের আয়োজন করছি না।

মৌলবাদের প্রকৃত স্বরূপ এ দেশে নৈতিকতা বিষয়ক এবং আচার সর্বস্ব। গল্পটা আমার অনুজকে নিয়ে। ওর নাম ইদু। ঈদের দিন জন্মেছিল।

আমার মা প্রায়ই বলতেন ইদু যখন ওনার গর্ভে তখন নানাকে স্বপ্নে দেখতেন। স্বপ্নে নানা মাকে বলতেন, তিনি আসছেন। এ জন্য ইদুকে মা বাপ বলতেন। আমার নানা পীর ছিলেন। তার অনেক কেরামতির গল্প শুনতাম। বেশির ভাগ অযৌক্তিক, এমনকি অনৈতিকও বটে।

ইদু নাকি দেখতেও অনেকটা নানার মতো। মাদ্রাসা না স্কুল ভাবতে ভাবতে অবশেষে আমার বাবা যে স্কুলের শিক্ষক সেখানে প্রাইমারি সেকশনে ভর্তি করানো হলো।

শিশুরা যে ধরনের দুষ্টুমি করে, কিশোররা যে ধরনের চঞ্চলতা লালন করে এমনকি বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েরা যে ধরনের উচ্ছলতা এবং হীনম্মন্যতায় ভোগে, এ পর্যন্ত প্রাকৃতিক কোনো নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। হয়তো এরপরই অনুপ্রবেশ ঘটে ধর্মীয় এবং আধুনিক কিছু নিয়মের বেড়াজাল। সামনে ওর এসএসসি পরীক্ষা। প্রাকৃতিক দুর্যোগে পরীক্ষার নির্ধারিত ডেট পরিবর্তন করা হলো। এই ফাকে পরিবর্তন ঘটলো ওর জীবনের ছন্দ।

আমাদের বাড়ির সামনে এক হুজুর টাইপের মাস্টার বাসা ভাড়া নিয়ে থাকেন। ওর প্রথম ছন্দপতনের উদ্ভাবক তিনি। অবশ্য এ পরিবর্তনকে খারাপ বলা যাবে না। একজন মুসলমানের সন্তান হিসেবে এ তার ফরজ দায়িত্ব। নামাজ, রোজা, কোরআন পাঠ ইত্যাদিতে ও নিজেকে পেশ করলো। পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এগুলো ইতিবাচক। কারণ ওর জন্ম মধ্যবিত্ত, মুসলিম পরিবারে। আর এ ধরনের পরিবারে ধর্মের গুরুত্ব যথেষ্ট। সমস্যা দেখা দিল ওর পোশাক দাড়ি এবং পান খাওয়া নিয়ে। কেউ ওকে দেখে আমার ছোট মানতে রাজি হয় না। মাঝে মধ্যে সারা রাত ইবাদত বন্দেগিতে মত্ত থাকে।

এসএসসিতে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করে স্থানীয় কলেজে ভর্তি হলো। কিন্তু কলেজে ওর যাতায়াত নেই বললেই চলে। কলেজে ছেলেমেয়ে একত্রে ক্লাস করে যা শরিয়ত সম্মত নয়। প্রচলিত পড়াশোনায় ওর আগ্রহ দিন দিন কমতে লাগলো। ফল স্বরূপ ইন্টারমিডিয়েটে সেকেন্ড ডিভিশনে পাস করলো।

এরপরই ও প্রচলিত পড়াশোনায় ইস্তফা দিতে চাইলো।

আমরা সবাই ওকে বোঝালাম। তবে যে বিষয়টা নিয়ে বেশি তর্কাতর্কি চলতো তা মূলত দাড়ি নিয়ে। বড়দের কথা, দাড়ি ভালোভাবে উঠুক তারপর দাড়ি রাখুক। তা না ফুরফুরে এলোমেলো অসমৃদ্ধ দাড়ি মুখে নিয়ে ওর আলখাল্লাহ পোশাক।

ইদানীং রোজ কিয়ামত ও ইমাম মেহেদির আবির্ভাবের সময় হয়েছে ইত্যাদি বলে। লাদেনকে নিয়ে বেশ আশাবাদী।

আমরা সবাই ওকে ডিগ্রিতে ভর্তির তাগিদ দিলাম।

কিন্তু ও একেবারেই বেকে বসলো। বছর দুয়েক পার হওয়ার পর হঠাৎ ভর্তি হলো, একবারে সেকেন্ড ক্লাসে পাসও করলো।

বাসায় ঠিক মতো থাকে না। তেমন কোনো পারিবারিক বা সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণও করে না। আমার কাছে খুব অবাক লাগে, যে ধর্ম মানবতার কথা বলে সে ধর্মের অনুসারীদের মাঝে সেবার মন তৈরি হলো না কেন। অথচ ধর্মের আনুষ্ঠানিকতায় এরা একেবারে বুদ হয়ে থাকে।

ওদিকে বাবা মারা যাওয়ার পর অভিভাবক পরিবর্তন হয়েছে। বড় ভাইদের মধ্যে ওকে নিয়ে বেশ কোন্দল চলছে। তাদের প্রত্যেকের সংসার আছে। কেউ আলাদাভাবে ওকে ভরণ পোষণ দেবে না। তাছাড়াও সংসারে হাজারো সমস্যা দেখা দিচ্ছে প্রতিনিয়ত যার উৎপত্তি আর্থিক দৈন্য থেকে। অগত্যা ও সিদ্ধান্ত নিল কিছু একটা করবে।

ঈদের ছুটিতে বাড়ি গেছি। আমাকে বললো, ও কোরবানির ঈদের পর ঢাকা আসবে। কোনো চাকরি না হলে প্রয়োজনে গার্মেন্টসে ঢুকবে।

আশ্বাস দিলাম।

বর্তমানে মিরপুরে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকি। ওকে অবশ্য আমার ইউভার্সিটির হলের ঠিকানা দিয়েছিলাম। কারণ আগে ও একবার ঢাকাতে ওই ঠিকানায় এসেছিল।

হঠাৎ সেদিন হলে গেছি। আমার আগের রুমমেট বললো, আপনার ছোট ভাই এসেছে।

একটু অবাক হলাম। কেন না কোরবানির ঈদের এখনো দুই মাস বাকি।

বাইরে থেকে ও যখন ফিরে এলো, ওকে দেখে তো আমার চক্ষু চড়ক গাছ। এ কি দেখছি আমি! প্যান্ট–শার্ট পরা ক্লিন শেভড এক সৌম্যকান্ত সুদর্শন যুবক।

এক গাল হেসে বললো, কাল আমার ইবনে সিনা ইন্টারভিউ।

কি বলবো ভেবে পাচ্ছি না।

ও আমার অবস্থা বুঝে নিজের থেকেই বললো, দেখলাম সেলস রিপ্রেজেন্টিভের চাকরি। একটু স্মার্ট না হলে তো চলবে না, তাই দাড়ি কেটে ফেললাম। মামা অবশ্য দাড়ি ছেটে আসতে বলেছিলেন। কিন্তু দাড়ি ছাটা আমার পছন্দ না।

আমাদের এক পাড়াতো মামা হাফেজ। তিনি ইবনে সিনায় চাকরি করেন। ওনার মাধ্যমে একটু যোগাযোগ করা হয়েছে।

আমি আর বেশি কিছু বললাম না। শুধু বললাম, ওনারা তো আবার দাড়ি ছেটে রাখা পছন্দ করেন।

সন্ধ্যার কিছু আগে ওকে নিয়ে বের হলাম শাহজানপুরের উদ্দেশ্যে। মামার বাসা শাহজাহানপুরে। ওনার সঙ্গে আগে থেকেই আলাপ করে রাখা ভালো।

দুঃখের বিষয় রাত দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও মামার সঙ্গে দেখা হলো না। পরদিন সকাল নয়টার দিকে ইবনে সিনা অফিসের সামনে দুজন ঘোরাঘুরি করছি। উদ্দেশ্য, ইন্টারভিউর আগে মামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। অবশেষে তিনি এলেন।

কি হুজুর, একেবারে ক্লিন শেভড! আমি তো দাড়ি ছাটতে বলেছিলাম।

ও আমতা আমতা করে কিছু বললো।

ইন্টারভিউতে কি ধরতে পারে, মামাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

তিনি বললেন, তেমন কিছু না। তবে এলাকার এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ের দুই একজন নেতার নাম জিজ্ঞসা করতে পারে।

কয়েকজনের নাম বলে অভয় দিয়ে চলে গেলেন অফিসের ভেতর।

আজ মৌখিক পরীক্ষা। আগামীকাল লিখিত পরীক্ষা। বিকেলে মৌখিক বাছাইয়ের তালিকা টাঙিয়ে দেবে। আবার এসে তালিকা দেখে যাওয়ার প্রযোজন নেই। আগামীকাল তুই সকাল নয়টায় উপস্থিত হবি। আমি বারোটার দিকে আসবো। পরীক্ষা দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত।

পরদিন দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে অফিসের সামনে দাড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি। কিন্তু কোথাও ইদুকে দেখতে পেলাম না। ভাবলাম পান খেতে হয়তো আশপাশে কোথাও গেছে। প্রায় একটা বেজে গেল, ওর কোনো খোজখবর নেই। অগত্যা গেটের কাছে এসে দারোয়ানকে বলবো মামাকে ফোন দিতে। হঠাৎ দেয়ালে চার্ট টাঙানো দেখে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু এ কি চার্টে তো ওর নাম নেই। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। বার বার তালিকাটা খুটিয়ে দেখছি। অবশেষে কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে অফিসের গেট থেকে মামাকে ফোন করলাম। তার ভাষ্য কোনোভাবেই আধুনিক ও সৃজনশীল মনে হলো না।

তারপর হলে এলাম। ইদুকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার বলতো?

ও বললো, ইন্টারভিউতে ওকে দাড়ি সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন করা হয়েছিল। ওর দৃষ্টিকোণ থেকে দাড়ি ছেটে রাখা আর একেবারে না রাখা সমান বিষয়।

পক্ষান্তরে ওনাদের ভাষ্য অনুসারে ছবিতে দাড়ি ছিল, এখন নেই কেন? তবে যদি দাড়ি একেবারে কেটে না ফেলে ছেটেও আসতো, আপত্তি ছিল না।

মামা বলেছিলেন, তিনি যদি বিষয়টি কাল জানতেন তবুও একটা কিছু করতে পারতেন। অর্থাৎ স্বজনপ্রীতির ব্যাপার এসে যাচ্ছে। তাহলে সত্য এবং সততার মাপকাঠি কোনটি?

ইদু যুক্তি দেখিয়েছিল দাড়ি রাখা সুন্নত। কিন্তু হালাল রুজি উপার্জন ফরজ।

আজ এ পর্যন্ত থাক। ওকে বেশি ঘাটিয়ে লাভ নেই।

নিজের কাছে এবং আধুনিক সমাজ সচেতনদের কাছে প্রশ্ন রাখতে পারি, এ কি সভ্যতার সততা? একজন মানুষ যে অন্তরে প্রতি পদক্ষেপে ধর্ম আকড়ে ধরেছিল, বর্তমানের আর পাচটা ধান্দাবাজ ছেলেমেয়েদের মতো জীবনযাপন করেনি, সে আজ দাড়ি কেটে ফেলার কারণে চাকরিটা পেল না। আত্মগ্লানিতে ওর চোখ অশ্রুসিক্ত হলো।

আমরা মৌলবাদ নিয়ে অনেক কথা বলি। আসলে এর স্বরূপ সম্পর্কে জানি না। এটি ঘৃণিত নয় ঠিকই কিন্তু প্রশংসারও যোগ্য নয়। এ ব্যাপারে আমাদের আরো বেশি সতর্ক হওয়া উচিত।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

মন তুমি পাহাড় ছুয়েছো

– মাসুদ এনাম

ভোর ঠিক ছয়টা। ট্যাকসিক্যাব ছুটে চলেছে কমলাপুর রেল স্টেশনের দিকে। ফাকা রাস্তায় ভোরের মিষ্টি আমেজে পনেরো মিনিটেই পৌছে গেলাম আমরা। আমরা চার বন্ধু। সেলিম, তমাল আর আমি, সঙ্গে আমাদের হোস্ট বন্ধু সিলভালামিন। যাচ্ছি ওর মামার বাড়ি শ্রীমঙ্গলের নিরালা পুঞ্জিতে। সত্যজিৎ রায়ের *অরণ্যের দিনরাত্রি*-র সঙ্গে মিল ওইটুকুই, আমরাও চার বন্ধু। ওরা গিয়েছিল সাওতাল পরগণায় বনভ্রমণে আর আমরা যাচ্ছি পাহাড়ে।

পারাবত ছাড়লো ছয়টা পঞ্চাশ মিনিটে। ঢাকা ছেড়ে গাজীপুর হয়ে ট্রেন ছুটে চললো। ট্রেনেই সেরে নিলাম সকালের নাশতা।

বন্ধু সিলভা উদ্বিগ্ন, ট্রেন প্রায় দুই ঘণ্টা লেট। সমস্যা হয়ে যাবে যদি শ্রীমঙ্গলে গিয়ে জিপ না পাওয়া যায়। তাহলে আজ আর নিরালা পুঞ্জিতে যাওয়াই যাবে না। সেলফোনে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে যাচ্ছে সিলভা যাতে জিপ আমাদের জন্য কিছুটা অপেক্ষা করে। অবশেষে দুটোয় শ্রীমঙ্গলে পৌছা গেল। জিপ শুধু আমাদেরই অপেক্ষায় দাড়িয়ে। দুপুরের খাবারটা দশ মিনিটেই সারতে হলো।

বন্ধুর মামা স্বয়ং এসেছেন আমাদের রিসিভ করতে। ততোক্ষণে জিপ ভরে উঠেছে যাত্রীতে।

ড্রাইভার বলে উঠলো, সাংবাদিক তিনজন সামনে বসেন।

আমরা রীতিমতো অভিভূত (আমি তো সাংবাদিক নই, শুধু সাংবাদিকের বন্ধু)।

শ্রীমঙ্গল থেকে দক্ষিণ দিকে যাত্রা শুরু, দুপাশে ফিনলের বিভিন্ন এস্টেটের চা বাগান। শুক্রবার বিকেল, চা শ্রমিকদের দেখা মিললো কমই। কেউ কেউ চা পাতা তুলছে, লাইনে দাড়িয়ে দেখলাম কুলি মেয়েরা ওজন করে চা পাতা জমা দিচ্ছে। কোথাও দেখলাম শেড টৃর নিচে বসে বিশ্রামের ক্লান্তি দূর করছে ওরা।

জিপের ড্রাইভার ইয়াসিন আলী, বাড়ি লাকসাম, কুমিল্লা। গায়ে–গতরে বেস সবল। তেইশ বছর ধরে ড্রাইভিং লাইনে। প্রথমে যে সাড়ে তিন বছর ছিল হেলপার, এখন পাক্কা ড্রাইভার। পাকাই বটে, আমরা হরিণছড়া পাহাড়ের শ শ ফিট ঢাল বেয়ে কখনো উঠছি, কখনো নামছি, ও হেসে হেসে গল্প করছে আর ডানে বামের গভীর খাদগুলো দেখিয়ে দিচ্ছে আমাদের।

তাকিয়ে দেখছি। তলা কোথায় কে জানে। পাহাড় কেটে সরু রাস্তা, এক সঙ্গে একটি গাড়িই শুধু চলতে পারে। মুহূর্তের অসতর্কতায় জিপশুদ্ধ আমরা নিমেষেই খাদের তলানিতে হারিয়ে যেতে পারি। সে এক রোমাঞ্চকর যাত্রা, ভয় তো ছিলই।

ড্রাইভার বলছে, আজ পর্যন্ত নাকি একটি গাড়িও খাদে পড়েনি। তবে বর্ষাকালে ঢাল বেয়ে নামা খুবই ঝুকিপূর্ণ।

আমরা যাচ্ছি নিরালা পুঞ্জির খাসিয়া পল্লিতে। পাহাড়ি পথে প্রায়ই দাড়িয়ে পড়ে আমাদের জন্য পথ করে দিচ্ছে সাওতাল, উড়িষি পরিশ্রমী যুবকেরা। কাধে তাদের বুনো বাশের বিশাল বোঝা। পায়ে হেটেই ওরা দুর্গম পথ পাড়ি দিচ্ছে।

হরিণছড়ার পরে এবার আলোছড়া পাহাড়, জুম চাষ হচ্ছে এখানে শুধু পানের। গাছে গাছে পান পাতার যেন প্রাণের উচ্ছ্বাস। জিপ এবার পাহাড়ে আরো উপরে উঠছে, নামছে। কিন্তু ততোক্ষণে আমাদের ভয়টা একেবারেই কেটে গেছে।

একটু পরেই পৌছে গেলাম নিরালা পাহাড়। সেখানেই নিরালা পুঞ্জির অবস্থান। দূরত্ব শ্রীমঙ্গল থেকে বাইশ কিলোমিটার যেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে মনোমুগ্ধকর আতিথেয়তা।

মাতৃতান্ত্রিক খাসিয়া পরিবারের মেয়েরা যথেষ্ট স্মার্ট, গৃহকর্ত্রী আমাদের স্বাগত জানালেন হ্যান্ডশেক করে।

দুদফা নাশতা শেষে চা, তারপর গোসলের উদ্যোগ।

সাত ঘণ্টা ট্রেন জার্নির ক্লান্তি পুরো শরীর জুড়ে। গোসলের জন্য গেলাম অন্তত একশ ফিট নিচে খাদের তলার কূপ তলায়। বালতি বালতি জল তুলে কুয়োর জলে শান্তিস্নান। কূপ তলায় নেমেছিলাম মাটির সিড়ি বেয়ে, উঠতে হবে সেখানেই। কিন্তু উঠতে গিয়ে টের পেলাম মজাটা, প্রায় দম বন্ধ অবস্থা।

গোসলের পর শরীর জুড়ে এবার শীতল সজীবতা, বেরিয়ে পড়লাম পুঞ্জি ঘুরতে। আমাদের সঙ্গী হলেন ভারতদা, চল্লিশ ছুই চুই এই মানুষটা এখনো অকৃতদার। তবে শিগগিরই নাকি বিয়ে করছেন। ভারতদার তেমন কাজকর্ম নেই, জুমে আছে পানের চাষ আর আছে ঘুরে ঘুরে সবার উপকার করে বেড়ানোর সখ।

সব সমাজেই ভারতদার মতো মানুষ থাকেন।

খাসিয়া পল্লির প্রতিটি বাড়িই প্রায় এক ধাচের। বাশ, কাঠের বেড়া, টিনের চাল আর পাকা মেঝে। সব বাড়িতেই স্বতন্ত্র ড্রয়িংরুম যার চারপাশেই দরজা। বলতে গেলে সবাই এখানে সচ্ছল, পান জুম থেকে প্রচুর পয়সা আসে তাদের হাতে। তবে ভবিষ্যৎ ভাবনা বা সঞ্চয় প্রবণতা নেই এদের।

সময়ের অভাবে ফিরতে হলো পরের দিন সকাল নয়টায়। তবে ফেরার আগে রেখে এলাম খাসিয়াদের স্নিগ্ধ আন্তরিক আতিথেয়তা ভরা মধুর কিছু স্মৃতি। আদিবাসীদের নিয়ে কি ভুলটাই না বোঝানো হয় এবং এখনো হচ্ছে।

ইনডিয়ার মেঘালয় খাসিয়াদের নিজস্ব রাজ্য, বাংলাদেশে এরা সংখ্যায় ত্রিশ হাজার। ইকো পার্ক, বাঙালি বসতি, বাঙালি সংস্কৃতির আগ্রাসন, সরকারি সেবা ও উন্নয়ন, বঞ্চনাসহ অজস্র সমস্যা তাদের। নতুন যোগ হয়েছে পান পাতার মড়ক।

আলবিনুসের মতো পান চাষী যুবক, আলবিনুসের ছোট্ট ছেলে আফ্রদির মতো চোখে মুখে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ভরা নবপ্রজন্ম আর সিলভালামিনের মতো উচ্চ শিক্ষিত খাসিয়া একদিন তাদের সব শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে নিরালা পুঞ্জির মতো প্রতিটি খাসিয়া পল্লিতে নিয়ে আসবে সোনালি ভোর। সে প্রত্যাশা প্রত্যয়ই যেন দেখে এলাম নিরালা পুঞ্জির প্রতিটি খাসিয়ার চোখে-মুখে।

ঢাকা থেকে

masudenam@yahoo.com

একটি রাত

- কামরুজ্জামান কাজল

টয়লেটের সামনে বসার কোনো জায়গা হলো নাকি? সিট না পেলে ট্রেনে আসেন কেন, বাসে চলাচল করতে পারেন না? কড়া গলায় মহিলা বললেন।

আমি রেলওয়ের একজন স্টাফ।

স্টাফ হয়েছেন, তাহলে আপনি সিট নিয়ে এলেন না কেন? আপনাদের রেলওয়ের কর্মকর্তারা তো এসি কোচ, ফার্স্ট ক্লাসগুলো দখল করে চলাফেরা করেন এটা তো সবাই জানে। তাহলে আপনাদের এ বেহাল অবস্থা কেন? এভাবে টয়লেটের সামনে বসে থাকলে যাত্রীরা অস্বস্তি বোধ করতে পারে।

সমস্যা তো বুঝতেই পারি, কি করবো, সবেমাত্র চাকরিতে ঢুকেছি, নিয়ম-কানুন তো এখনো পুরো জানা হয়নি। যারা চাকরি করেন, অনেককেই এভাবে চলাচল করতে দেখি। রাতের ব্যাপার তো, সম্ভবত যাত্রীদের তেমন কোনো অসুবিধা হয় না।

কর্মকর্তাদের কথা বললেন, তাদের সঙ্গে আমাদের মতো কর্মচারীদের তুলনা হয় নাকি, ওনারা আমাদের হর্তাকর্তা। ওনারা যদি এভাবে যায় তাহলে মান-সম্মানের প্রশ্ন হয়ে দাড়াবে। কষ্ট হলেও আমাদের যেতে হবে, ওনাদের ক্ষেত্রে তা অসম্ভব।

নতুন চাকরি পেয়েছি, ট্রেনিংয়ের জন্য থাকতে হয় চট্টগ্রামে। রাতের ট্রেনেই সুবিধা বেশি। তাই প্রায় সময় এভাবে আসা-যাওয়া করতে হয়। *তূর্ণা নিশিথা* ট্রেনে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় যাচ্ছি।

মহিলাটি কিছুক্ষণ পর পর টয়লেটে আসা-যাওয়া করছে। বিরক্তির চেয়ে ভালোই লাগছে ওনার আসা-যাওয়া। এমন সুন্দরী স্মার্ট মহিলা যে কোনো পুরুষের আকর্ষণ হতেই পারে। আমি যে বিরক্ত বোধ করছি না, তিনি ভালোই টের পাচ্ছেন। এ কারণেই হয়তো বার বার আসছেন। ওনার সিটটাও প্রায় কাছাকাছি।

আপা, আপনার কি ডায়বেটিস জাতীয় কোনো সমস্যা আছে?

তিনি রাগান্বিত হয়ে আমার দিকে চাইলেন এবং ধমকের সুরে বললেন, না। টয়লেটে গেলে আপনার সমস্যা কি?

না, বার বার যাচ্ছেন। তাই বললাম আর কি!

ওনার যে সিটটা তা এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। ধমক শুনে ওনার দিকে যতোবারই চেয়েছিলাম তিনি মুচকি হেসেছিলেন। ভাবলাম, আমাকে ধমক দিয়ে তিনি তৃপ্তি পেলেন যার কারণে হাসছেন। কিন্তু ঘটনা উল্টো। তখন প্রায় মাঝ রাত। সবাই ট্রেনের ভেতর ঘুমে ঝিম ঝিম ভাব অবস্থা। তাই টয়লেটের দিকে যাত্রীদের চলাচলও কম। তিনি আবার এসে হাজির।

আমি তো ভয়ে অস্থির, আবার ধমক দেবেন কি না। কিন্তু না। নরম কণ্ঠে বললেন, আমার ব্যবহারে কোনো কষ্ট পেয়েছেন কি?

না। কষ্ট পাওয়ার কি এমন হয়েছে। এটা অন্য যে কেউ হলে বলতো। তাছাড়া সুন্দরী মহিলার ধমক কতোজনের ভাগ্যে জোটে?

হেসে বললেন, তাই বুঝি।

শাড়িতে চমৎকার মানিয়েছে আপনাকে। সাহস করে বলেই ফেললাম।

কথা শোনার পর তিনি যে রাগান্বিত না হয়ে বরং খুশি হয়েছেন তা ওনার চেহারার আভাতেই বোঝা গেল।

কোথায় যাবেন, জিজ্ঞাসা করলাম।

ঢাকা যাবো, চট্টগ্রামেই থাকি। সঙ্গে শাশুড়ি ও ছেলে।

আপনার স্বামী কি করেন? ব্যবসা, না চাকরি?

না, তিনি বিদেশে থাকেন। মাঝে মধ্যে ছুটিতে দেশে আসেন।

কথায় কথায় যেমন সময় কাটছিল তেমনি ওনার অনেক কিছুই জানা হয়ে গেল। বিশেষ করে ওনার একাকীত্ব বোধ ও স্বামীর অনুপস্থিতিটা ভীষণভাবে কষ্ট দেয় তা আলাপ করেই বোঝা গেল। কথা বলার সময় ওনার শরীরের দিকে আড়চোখে যেভাবে বার বার লক্ষ্য করছিলাম তা ভালোভাবেই টের পেয়েছিলেন তিনি আর আমার তাকানোটা বেশ উপভোগ করছিলেন।

আড়চোখে দেখলেই হয়? ছুয়ে দেখতে ইচ্ছা করে না। কাপুরুষ কোথাকার। লজ্জামাখা হাসি দিয়ে বললেন।

কথা শুনে তো আমি অবাক। এ তো দেখি মেঘ না চাইতে বৃষ্টি। এমন সুন্দর ফিগার, কে বলবে এক বাচ্চার মা। ইচ্ছা তো হয়। কিন্তু যাত্রীদের এদিকে আসার ভয়ে আবার ইচ্ছাও হয় না, মনে মনে ভাবছি।

কোনো কিছু বোঝার আগেই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আমার ঠোট দুটো ওনার ঠোট দিয়ে চেপে ধরলেন।

আমার হাত দুটো অজান্তেই ওনার পিঠে, কোমরে, নিতম্বে, বুকের মাঝে প্রসারিত হতে লাগলো। ওনার হাতও আমার বিশেষ জায়গাগুলোকে ছুয়ে যেতে লাগল। উত্তেজিত অবস্থায় বলতে লাগলেন, আমাকে তোমার আদর দিয়ে দুমড়ে-মুচড়ে পিষে ফেলো।

উত্তেজনা ও আনন্দ শিহরণে আমিও পাগল হয়ে দুই বাহুর মধ্যে রেখে সমস্ত শক্তি দিয়ে পিষে ফেলতে চাইলাম। বন্ধ দরজার সঙ্গে ঠেস দিয়ে কতোক্ষণ যে কেটে গেল তা টের পেলাম না। হঠাৎ করে ট্রেন থেমে যাওয়ায় দুজন দুজনকে ছাড়িয়ে নিলাম। তিনি কাপড়, চুলগুলো ঠিকঠাক করে সিটে গিয়ে বসলেন।

দরজা খুলে বাইরের দিকে তাকালাম। এরই মধ্যে অনেকে টয়লেটের প্রয়োজন মিটিয়ে নিল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি ভোর হতে কিছু সময় এখনো বাকি আছে। ট্রেন চলতে শুরু করলো।

কি থেকে কি হয়ে গেল ভাবতে লাগলাম। তিনি আবার এসে হাজির।

দেখেন তো, ট্রেন আর থামার সময় পেল না।

বাদ দেন তো, যা ঘটার তা হয়ে গিয়েছে। এখন আর ভেবে কোনো লাভ নেই। আপনি সিটে গিয়ে বসুন।

বসবো মানে, খেলা তো সবে অর্ধেক হলো, বাকিটুকু হবে আমার বাসার বেডরুমের বিছানায়। পুরোটুকু না হলে আফসোস থেকে যায় না?

একটা কাগজ আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে, এদিক-সেদিক চেয়ে আলতো করে চুমু খেয়ে সিটে চলে গেলেন। কাগজটা খুলে দেখি বাসার ঠিকানা, ফোন নাম্বার, বাসায় যাওয়ার আগে ফোন করে অবশ্যই যেন যাই তা লেখা।

ট্রেন স্টেশনে থামলো। প্ল্যাটফরমে দাড়িয়ে ট্রেনের জানালার দিকে চেয়ে দেখি তিনি বিষণ্ন মুখে আমার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছেন।

ট্রেন চলে যাওয়ার পর পরই পকেট থেকে কাগজটা বের করে ছিড়ে ফেলে দিলাম। ঠিকানাটার তেমন কোনো প্রয়োজন অনুভব করলাম না।

ময়মনসিংহ থেকে

ক্রসফায়ারের রাজধানী

– জাহিদুল আলম জয়

এ বছর রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ভর্তি হই। শুরু থেকেই নিয়মিত ক্লাস করতে থাকি। কিন্তু কাকতালীয়ভাবে রিফাত স্যারের (ছদ্মনাম) ক্লাস প্রথম দেড় মাস করা হয়নি। ফলে রিফাত স্যারের আমার প্রথম ক্লাসটায় পেলাম তিক্ত এক স্বাদ। সেটাই এখন উপস্থাপন করছি।

শুরু থেকে ক্লাস না করার জন্য স্যার রোল কলের সময় আমাকে দাড় করালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, বাসা কোথায়?

বললাম, কুষ্টিয়া।

কি বললে? কুষ্টিয়া। সন্ত্রাসের জন্মদাতা, সন্ত্রাসের পিতৃভূমিতে তোমার বাসা?

হতচকিত হয়ে বললাম, জি স্যার!

জি স্যার মানে, তোমার কি খুব গর্ব হচ্ছে কথাটা শুনে?

লজ্জায় আমার মাথাটা হেট হয়ে গেল। একটু স্বাভাবিক হয়ে আমার যুক্তি উপস্থাপন করলাম। বললাম, কিছু সংখ্যক খারাপ মানুষের জন্য সবাইকে এক পাল্লায় মাপা ঠিক নয়। আমাদেরও প্রতিভা আছে, সুসন্তান আছে, আছে অনেক গুণীজন। সামগ্রিক ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেশের শ্রেষ্ঠ কয়েকটি জেলার মধ্যে কুষ্টিয়া হবে অন্যতম। এছাড়া কুষ্টিয়াকে বলা যায় *সাংস্কৃতিক রাজধানী*।

মনে হলো স্যার আমার কথাগুলো শুনে খুশি হলেন না। আমাকে বসতে নির্দেশ দিয়ে বললেন, নিয়মিত ক্লাস করবে।

এরপর থেকে বন্ধুরা ঠাট্টা করে প্রায়ই বলে, দোস্ত, ক্রসফায়ারের রাজধানীটা কোথায় যেন রে?

দুর্বাচারা, কুষ্টিয়া থেকে

অন্ধকারে

– ধীরাজ কুমার রায়

অন্য সবার মতো আমারও ইচ্ছা ছিল লেখাপড়া করে একটা ভালো রেজাল্ট করে, বিয়ে করে সুখে থাকবো। কিন্তু সবার কি সব আশা পূরণ হয়! মনে কতো স্বপ্ন ছিল। কতো সাধ ছিল বাবা-মায়ের সেবায় বাকি জীবন পার করবো। তাদের মনে কোনো কষ্ট দেবো না। কিন্তু এই আমার জন্য আজ তাদের এমন দুর্দশা যে তারা ঘর থেকে বাইরে বের হতে পারেন না। কারণ আজ আমি এমন এক জগতের বাসিন্দা যাকে সবাই নষ্ট জগৎ নামে জানে।

এ ঘটনার শুরু যখন স্কুল ছেড়ে কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলাম। আমাদের ক্লাসে দুইজন ছেলে ছিল যারা একটু বখাটে টাইপের। তাদের নাম ম্যাক ও কুনাল। তাদের শুধু একটাই কাজ, মানুষকে হেনস্তা করা। এমন কোনো নেশা ছিল না যা তারা করতো না। ক্লাসের সবাই তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিল। আমি যে এলাকায় থাকতাম সেই এলাকায়ই ছিল তাদের বাড়ি। আমাদের গলির মোড়ের বাদামতলা ছিল তাদের মূল আড্ডার স্থান। প্রতিদিন সন্ধ্যা সাতটার পর তারা সেখানে বসে আড্ডা মারতো।

একদিন খুব বৃষ্টি হওয়ায় আমার বাড়ি ফিরতে একটু রাত হয়ে গেল। যখন গলির মোড়ে এলাম তখন দেখি তারা দুজনে আপন মনে গান করছে আর সিগারেট টানছে।

তাদের পাওনা দিয়ে তাড়াতাড়ি হেটে জায়গাটা পার হওয়ার চেষ্টা করি। ম্যাক হঠাৎ আমার সামনে এসে পথ আগলে ধরে। সরে যেতে বললে সে বলে, এখনই কেন? আরেকটু পরে বাড়ি গেলে কি ক্ষতি হবে।

আমি বললাম, আমার পড়াশোনা আছে।

এ কথা শুনে কুনাল বললো, ওরে আমার বিদ্যাসাগর।

ম্যাক বললো, আসল পড়াশোনা তো আমরা করছি। আয় আমাদের সঙ্গে যোগ দে।

বললাম, দেখো, ভালো হবে না।

কুনাল বললো, এই ম্যাক, পণ্ডিত তো দেখছি আমাদের ধমক মারে। ভয় দেখায়।

ম্যাক বললো, ভয় দেখায় না। ওরে বাবার, আমি ভীষণ ভয় পাইছি। ধর শালারে আজ ওর পণ্ডিতগিরি ছোটাবো।

অমনি দুজনে মিলে জোর করে আমার মুখে একটা সিগারেট ঢুকিয়ে ছিল। তারপর ম্যাক তার লাইটারটা বের করে আমার চোখের সামনে বার বার জ্বালাতে নেভাতে লাগলো।

কোনো রকমে হাত ছুটিয়ে দৌড়ে জায়গাটা পার হয়ে যাই। বাড়িতে এসে সেদিন আর পড়াশোনায় মন বসাতে পারিনি।

কয়েক মাস পরের কথা। আমাদের প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষার তোড়জোড় চলছে। সাত দিন পরেই পরীক্ষা। আরেকটা কথা বলে রাখি, ম্যাক ও কুনাল দুজনেই ধনীর দুলাল হওয়ায় তাদের কিছু প্রভাব-প্রতিপত্তিও ছিল। রোজকার মতো সেদিনও ইউনিভার্সিটিতে গেলাম। গিয়ে দেখি চারদিকে কেমন থমথমে পরিবেশ। আমাদের ডিপার্টমেন্টে গিয়ে দেখি প্রচুর ভিড়। পুলিশও আছে। ব্যাপার কি! একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম গতরাতে কে বা কারা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র চুরি করতে এসে বনমালী (নাইট গার্ড) চাচার হাতে ধরা পড়ে যায়। পরিচয় প্রকাশের ভয়ে তারা তাকে খুন করে।

কথা শোনামাত্র তাড়াতাড়ি ভিড় ঠেলে ভেতরে গেলাম। দেখি বনমালী চাচার লাশের অবস্থাও ক্ষতবিক্ষত। মুখের দিকে তাকানো যায় না। সেই বনমালী চাচা যার সঙ্গে কতো হাসি-ঠাট্টা, দুঃখ সুখের গল্প করেছি।

হঠাৎ দেখি লাশের পাশে একটি লাইটার পড়ে আছে।

ভালো করে দেখে আমার বুকটা ছ্যাৎ করে উঠলো।

এ যে ম্যাকের লাইটার।

আমার বুকে ভয় দানা বাধলো। কিন্তু বনমালী চাচার হাসিখুশি মুখটা মনে পরতেই কোথা থেকে যেন আমার বুকে সাহস সঞ্চার হলো। সোজা চলে গেলাম কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারের কাছে। তাকে সব খুলে বললাম।

পুলিশ অফিসারটি সব কথা শোনার পর বললো, ভাই, একটু এদিকে আসেন, আপনার জবানবন্দি নেবো। কিন্তু এক পাশে এসে তার ভোল পাল্টে গেল। আমাকে বললো, দেখেন, আপনি ভালো ঘরের ছেলে, আপনাকে দেখে তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। বাবা-মা আপনাকে লেখাপড়া করতে পাঠিয়েছেন। লেখাপড়া

করেন। এসব খুনখারাবির মধ্যে আসবেন না। কি লাভ এসবের মধ্যে এসে আর যা জানেন তা চেপে যান, কেউ যেন জানতে না পারে।

পুলিশের কথা শুনে তো আমার মাথা খারাপ অবস্থা। কিন্তু আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি কেন যে তার কথা সেদিন মানিনি! মানলে আগের মতোই থাকতাম। কোনো কিছুই হতো না।

বললাম, আপনি একজন পুলিশের লোক হয়ে কিভাবে এমন কথা বলেন! আপনি প্রমাণ পেয়েও কেন তাদের ধরবেন না।

শুনে পুলিশ অফিসারটি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। দেখেন ভাই, এই সাধারণ একটা লাইটারের জন্য কাউকে ধরা যায় না। কারণ এ রকম লাইটার অনেকেরই থাকতে পারে।

তবুও হাল না ছেড়ে বলতে লাগলাম কিন্তু ওটা তো আপনি কোনো মার্কই করেননি। ওটা নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করালে আমি নিশ্চিত, ওটাতে ম্যাকের হাতের ছাপ পাওয়া যাবে।

পুলিশটি এবার ভদ্রতার মুখোশ ঝেরে ফেলে বললো, দেখ, খামাখা আমার মাথা গরম করিস না আর আমার কাজও আমাকে শিখাস না। কি লাভ তোর একজন ভদ্রলোকের পেছনে লেগে। যা শেষবারের মতো বলছি, ভালোয় ভালোয় বাড়ি চলে যা।

আমার মেজাজও তখন তুঙ্গে। বললাম, আপনি ভদ্রভাবে কথা বলুন। আপনার এ সুকর্মট পুলিশ কমিশনারের কাছে পেশ করবো। তখন দেখি আপনি কিভাবে এই ধনীর দুলালদের রক্ষা করেন?

তাই, আচ্ছা যা নালিশ কর, যা যা। বলেই আমাকে ধরে মারতে শুরু করলো। লোকজন এলে সে বললো, এই খুনি।

আমার ভেতরটা তখন ধক করে জ্বলে উঠলো। সব আক্রোশ নিয়ে পুলিশ অফিসারের ওপর ঝাপিয়ে পড়লাম। আরো পুলিশ এসে আমাকে ছাড়িয়ে ভ্যানে তুলে থানায় এনে লকারে পুরে রাখলো। সারা রাতদিন আমার ওপর তারা যে নির্যাতন করলো, তারপরও আমি কিভাবে যে বেচেছিলাম সেটা ভাবতেই অবাক হয়ে গেছি।

পরদিন সকালে যখন জ্ঞান ফিরলো, দেখি ম্যাক আর কুনাল এসেছে।

ম্যাক আমাকে বললো, কি রে কুত্তার পো, আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবি। দেখ এখন আমি তোর কি করি।

কুনাল বললো, দে না হালারে পরপারে পাঠায়া।

ম্যাক বললো, না, এভাবে না, হালারে এমন মরণ দিমু যে বাইচ্যা থাইক্যাও মরনের স্বাদ ভোগ করবো।

ম্যাক ও কুনাল সব পেপারে আমার ছবি ছাপালো এবং আদালতেও আমাকে খুনি বলে প্রমাণ করলো। লোকে আমার বাবা–মাকে নানানভাবে অপদস্থ করতে লাগলো। তাদের সমাজ থেকে এক ঘরে করে দেয়া হলো। শুধু চুপচাপ দেখে গেলাম, শুনে গেলাম। সত্যের সঙ্গী হতে গিয়ে আজ আমার এমন অবস্থা যে মাঝে মধ্যে ভাবি, কেন আমি এ ধরায় জন্মগ্রহণ করলাম।

একদিন সুযোগ বুঝে জেল ভেঙে পালালাম। বাসায় যাওয়ার শত চেষ্টা করেও যেতে পারলাম না। কারণ বাড়ির চারপাশে কড়া পাহারা বসানো হয়েছে।

এমনি আমি এক বড় ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করলাম। তার কাছে সাহায্য চাইলাম। তারই সহায়তায় জানলাম এ পৃথিবীতে কিভাবে বাচতে হয়। বাচার আসল নিয়ম।

অবশেষে আমার আবির্ভাব ঘটলো এক নতুন মানুষ রূপে। যে এখন কাউকে ভয় পায় না। কারো প্রভাবে চলে না। নিজেই নিজের নিয়ন্তা। এমনকি সে ঈশ্বরকেও মানে না। সে কোনোভাবেই আর আগের স্বাভাবিক সুস্থ জীবনে ফিরে যেতে চায় না। অবশ্য চাইলেও যেতে পারবে না। এখান থেকে বের হওয়ার একটাই পথ মৃত্যু।

তাই আমি সমাজের কর্ণধারদের কাছে প্রশ্ন রাখি, কেন আজকাল তরুণদের এ অবস্থা যারা চাইলেও সত্যের সঙ্গী হতে পারে না? মুখ বুজে চুপচাপ পড়ে থাকে কিসের ভয়ে? কিসের জন্য আমাদের মতো তরুণরা হয়ে যায় এক অসুস্থ জীবনের পথিক?

ঢাকা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা থেকে

স্বামী

– মেঘ বালিকা

ঘটনাটা হঠাৎ করেই ঘটে গেল।

ছেলের মা আমাকে দেখে এতো পছন্দ করলেন, তিনি আমাকে তার ছেলের বৌ অথবা নাতির বৌ বানাবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। পরে শ্বশুরবাড়ির সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয়, আমি শাশুড়ির ছেলের বৌ হবো।

আজ আমার বাসর রাত। গায়ে হলুদ থেকে বিয়ে পর্যন্ত সব খরচ আমার স্বামীই বহন করেছে। এ যেন এক রাজকীয় বিয়ে আর আমরা অত্যন্ত শাদাসিধে মানুষ। এতো খরচ করার মতো অর্থও আমাদের নেই।

যাই হোক। আমি বাসর রাতের গল্প বলছিলাম। আমার স্বামী অত্যন্ত ধৈর্যবান এবং নম্র স্বভাবের মানুষ।

ওহ! প্রথমেই বলে নেয়া ভালো, আমি আমার স্বামীর দ্বিতীয় বৌ। আর আমাদের বয়সের ব্যবধান বত্রিশ বছরের। মানে আমার তেইশ এবং স্বামীর পঞ্চান্ন। এ জন্য অভিজ্ঞতাটা ওনার বেশিই।

বাসর ঘরে আমার হাতটা ধরে একটু চুমু খেলো সে। ঘোমটা ফেলে দিল। খুব আস্তে করে বললো, গয়নাগুলো খুলে ফেলো।

চল্লিশ ভরি গয়না পরে আমার সত্যিই তখন বিরক্ত লাগছিল।

সেও গয়নাগুলো খুলতে সাহায্য করলো।

শাড়িটা পুথি, চুমকিতে এতো ভারি কাজ করা, আমি এসি রুমেও শান্তি পাচ্ছিলাম না।

সে উঠে গিয়ে লাইটটা অফ করে দিল। এরপর আমার শাড়িটাও অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে খুলে ফেললো।

লজ্জায় যেন মাটি না বিছানার সঙ্গে মিশে যাচ্ছিলাম। আমার ব্লাউজটাও যেন তার কাছে মহা বিরক্তকর। সেটাও খুলে ফেললো।

এবার আমি বাধা দিলাম।

স্বামী তখন তার কাজে ব্যস্ত। ব্রা, পেটিকোট কোনোটাই সে আমার গায়ে রাখতে চায় না। সবই সে খুলে ফেললো।

এবার জোর করে নিজেকে ছাড়াতে চাইলাম। স্বামীর গায়ে তখন অসুরের মতো শক্তি।

প্রথম রাতেই তার পাওনা বুঝে নিল।

শরীরের প্রথম এই ব্যথা সহ্য করতে না পেরে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু হুশ ছিল। কি ঘটছে আমার পাশে তা বুঝতে পারছিলাম।

লাইট জ্বালিয়ে সে বাথরুম সেরে এসে পানি খেল। বেড লাইটটা অফ করে এবার ডিম লাইটটা জ্বাললো। আমার চোখে, ঘাড়ে, গলায় অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পানির পরশ বুলিয়ে দিল।

আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হলাম।

কিন্তু স্বামীর ডান হাতটা যেন আমার বুকের ওপর থেকে সরেই না।

এতো বিরক্ত লাগলো তখন মানুষটিকে। হাতটা সরিয়ে দিতে গেলাম।

সে আরো জোরে হাতটা চেপে ধরলো আমার বুকে।

বুঝতে পারলাম বাধা দিতে গেলে সেটা আরো বেশি করে করবে। এদিকে তলপেটের ব্যথায় চোখ মেলতে পারছি না।

সে একটা কথা আমার কানে কানে বললো, আর তা হলো, দেশি বৌ যে এতো মধুর হয় আগে জানতাম না।

ঠিক এক ঘণ্টা পর সে আবার শুরু করলো পাওনা আদায় করতে।

আমার তখনো মাথায়ই আসছে না পঞ্চান্ন বছরেও মানুষ এতো স্ট্রং থাকে কিভাবে?

স্বামী বললো, আমার এই যন্ত্রণাটুকু তোমাকে সহ্য করতেই হবে।

এবার আর সহ্য করতে পারলাম না। চিৎকার করে কেদে উঠলাম। সে খুব যত্নের সঙ্গে এক হাতে আমার মুখ, আরেক হাতে আমার দুই হাত চেপে ধরলো। প্রায় পনেরো মিনিট পর আমাকে মুক্তি দিল।

আমি মুক্তি পেয়ে কাপড় ঠিক করে একটু ঘুমানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু রাগে আর ব্যথায় আমার যেন ঘুমই আসছে না। ভোরবেলা একটু ঘুমালাম। হঠাৎ দেখি ভার ভার লাগছে। চোখ খুলেই বুঝলাম সে আবার শুরু করেছে পাওনা আদায় করতে। এবার আর বাধা দিলাম না। রাগে আমার সারা শরীর জ্বলে যেতে লাগলো। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম এর প্রতিশোধ একদিন তুলবোই।

আমার মুখে, গলায় সে এতো দাগ করে রাখতো, কারো সামনে যেতে খুবই লজ্জা পেতাম। তার অবস্থাটা এমন, যখনই তার মনে চাইবে তখনই তার পাওনা দিতে হবে। নইলে জোর করে আদায় করে নেবে।

একদিন বাসায় অনেক গেস্ট। আমি সব রান্না করেছি। শুতে গিয়ে অনেক রাত হয়ে গেল। ততোক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে।

একটু শান্তি পেলাম। আমার ঘরের সঙ্গেই এটাচড বাথরুম। বাথরুমে বাথটাবও আছে। গোসল করে একটু পর ঘুমাবো ভাবলাম।

বাথটাবে খোলা শরীরটাকে ছেড়ে মাথায় শ্যাম্পু করছি। হঠাৎ বাথরুমের দরজায় জোরে জোরে শব্দ। ভাবলাম স্বামী হয়তো বাথরুম করবে। কোনো রকম তোয়ালে প্যাচিয়ে দরজা খুলে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে বাথটাবের ভেতর ঝাপিয়ে পড়ল আমাকে নিয়ে তার পাওনা আদায় করতে।

আমার স্বামীর প্রথম বৌ ছিলেন বিদেশি।

অস্ট্রেলিয়ান।

সেই সংসারে একটা ছেলে ও একটা মেয়ে আছে। আমার থেকে তারা বয়সে অনেক বড়। প্রথম বৌয়ের সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গেছে তার। এ জন্যই আমার ভাগ্য আমার স্বামীর কাছে নিয়ে এসেছে।

বিয়ের এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা হানিমুনে গেলাম সিংগাপুর, মালয়শিয়া। আমার শাড়ি পরতে খুব ভালো লাগে। নতুন দেশ দেখতেও আমার আগ্রহের সীমা নেই। বাইরে গিয়ে সে সারাক্ষণ হয় আমার হাত ধরে থাকবে নয়তো জড়িয়ে ধরে হাটবে আর হোটেলে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই আমার শাড়ি খুলে তার পাওনা আদায়ে ব্যস্ত থাকবে।

আমার খুব প্রিয় একটা শাড়ি তার জোরাজুরিতে একদিন ছিড়ে গেল। মাথায় এতো রাগ উঠে গেল, ঝগড়া করলাম অনেক। রাতে না খেয়েই শুয়ে পড়লাম।

সিংগাপুরে একটা ইনডিয়ান মার্কেট আছে, যেখানে শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ সবই পাওয়া যায়।

আমাকে নিয়ে শাড়ি কিনতে গেল সে।

একজন বাঙালি সেলসম্যান ছিল সেই দোকানে। সে প্রথমে আমাদের সম্পর্কটা বুঝতে পারেনি।

আমার যদি একটা শাড়ি পছন্দ হয় তো স্বামীর হয় আরেকটা।

বাঙালি সেলসম্যান না পেরে বললো, স্যার, আপনার মেয়ে যেটা পছন্দ করে সেটাই নিয়ে যান।

আমার স্বামী রাগ করে বিশটা শাড়ি কিনলো ওই দোকান থেকে।

হোটেলে ফিরে আসার পথটুকু আনন্দেই ছিলাম। আজ একটু হলেও তাকে জব্দ করা গেছে।

মাঝে মধ্যে খুব খারাপ লাগলেও সান্ত্বনা পাই এটা ভেবে যে এতো ভালোবাসাই বা কয়জনে পায়? হোক না অসম বিয়ে, তবু তো ভালোবাসা।

আস্তে আস্তে এভাবেই দিন যেতে লাগলো।

স্বামী যেভাবে উর্বর জমিতে লাঙল চরিয়েছে তাতে বিয়ের দুই মাসের ভেতরই ধরা পড়লো আমি প্রেগনান্ট। আমি অনেক খুশি হলেও বুঝলাম যে একটু অখুশিই আছে। আমরা এখন চলতে পারি দুজনার মতামতেই আর অপেক্ষায় আছি বিয়ের রাত থেকে যে ফসলের বীজটি সে আমার ভেতরে রোপণ করেছে সেই চারাটির জন্য।

ঢাকা থেকে

SMS

– মোহাম্মদ ইব্রাহীম

চট্টগ্রামের দুই নাম্বার গেট টিঅ্যান্ডটি কলোনিতে আমার বেড়ে ওঠা। এর মাঝে বিশটি রোজার ঈদ উদযাপন করেছি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে। কলোনির ঈদ যে কতো আনন্দের তা একমাত্র যারা কলোনিতে বসবাস করে তাদের পক্ষেই জানা সম্ভব।

ঈদের আগের দিন রাতে চাদ দেখার জন্য কলোনির মাঠে ছোট–বড়, বুড়া–বুড়ি, ছেলে–মেয়ে ইফতার না খেয়ে শুধু পানি মুখে দিয়ে জড়ো হতো। যখন চাদ দেখা যেতো তখন একদল করতো ছোটাছুটি, কেউ বা বসে আড্ডা, চিৎকার, কেউ বা জল্পনা–কল্পনা, কেউ বা শুধু লম্ফ–ঝম্ফ। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে মাঠে এক আনন্দ মেলা চলছে।

কলোনির সকলের এক সঙ্গে দল বেধে নামাজে যাওয়া এবং ফিরে আসাটা ছিল উপভোগ করার মতো। নামাজের পর প্রথম দুই ঘণ্টা কেবল কোলাকুলিতেই কেটে যেতো। এরপর এক এক বয়সের ছেলেমেয়েরা নানান দলে বিভক্ত হয়ে একের পর এক সকল বাসায় ঘুরে রাত বারোটা বাজার আগেই পেটটার বারোটা বাজিয়ে ফেলতো।

২০০২–এর এপৃল মাসে পাড়ি দিই সউদি আরবে। কাজ করতে থাকি একটি *বাক্কালায়* (ডিপার্টমেন্ট স্টোর)। আমাদের দেশের ঈদ আর এ দেশের ঈদ আকাশ–পাতাল পার্থক্য। বাংলাদেশের ঈদে যে রকম জৌলুস থাকে, এখানে তা কোথাও পাওয়া যাবে না। এরা অর্থের দিক দিয়ে যতোটুকু ধনী, মনের দিক দিয়ে ঠিক ততোটুকু গরিব। বংশ মর্যাদার কারণে ঈদের দিন পর্যন্ত এক বংশের লোক অন্য বংশের বাড়িতে বেড়াতে যায় না।

ঈদের সময় দোকানে বেচাকেনা বেশি হওয়ায় আঠারো থেকে বিশ ঘণ্টা ডিউটি।

ঈদের আগের দিন রাত দুইটায় দোকান বন্ধ করলাম। রুমে গিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম কি রান্না করা যায়। কাল কিছু খেতে হলে এখনই রান্না করতে হবে। কিন্তু রান্না, গোসল এবং খাওয়া–দাওয়া করতে গেলে ভোর চারটা বেজে যাবে। তারপর সকাল ছয়টায় দোকান খুলে রাত দুটা পর্যন্ত একটানা ডিউটি করতে হবে।

সিদ্ধান্ত নিলাম না খেয়ে থাকা যাবে। কিন্তু না ঘুমিয়ে কোনো মতেই এই দীর্ঘ সময় ডিউটি করা যাবে না। তাই না খেয়ে ঘুমিয়ে গেলাম। সকাল ছয়টায় দোকান খুললাম। দোকান খোলার পর হৃদয়ের কোথায় যেন মোচড় দিয়ে উঠলো জীবনের প্রথম ঈদের নামাজ না পড়ার বেদনায়।

বাজি জাতীয় জিনিসের জন্য সউদি ছেলেমেয়েরা দোকানে ভিড় করছে।

সকাল আটটার দিকে অনেক কষ্টে দুধ আর কেক খেলাম।

আস্তে আস্তে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে লাগলো। ক্ষিধেয় পেটের ভেতর ছোট্ট একটি টর্নেডো হতে লাগলো। কিন্তু কিসের এক বিষণ্নতায় মুখে কিছুই দিতে পারলাম না আর জোর করে কিই বা খাওয়া যেতো? দোকানের হাবিজাবি নয়তো বা *খেফছা* (ভাত ও মুরগি ভাজা)।

অন্য সময়ে দোকানে কাস্টমার থাকলে খুশি হতাম। আজ কাস্টমার ঢুকলেই মেজাজ একেবারে বিগড়ে যাচ্ছে। ওদিকে কিছু দুষ্ট ছেলে ইচ্ছা করে দোকানের ভেতর বাজি ফোটাচ্ছে। ইচ্ছা করছে তাদের ধরে এনে দুগালে দুটি থাপ্পড় দিই। কিন্তু আইনের কারণে থাপ্পড় দেয়া তো দূরের কথা, একটা ধমক পর্যন্ত দেয়া যাবে না।

দিন শেষে কখন যে রাত দুটা বেজে গেল টেরই পাইনি। অবশ শরীর নিয়ে রুমে এলাম। খাবারের কোনো আয়োজন না করেই গোসল করে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলাম। চোখ বন্ধ করে কল্পনায় অতীত দেখতে লাগলাম।

ঈদের আগের দিন রাতে আমি, আম্মা, ছোট বোন মরিয়ম ও ফাতেমা খুব উৎসাহ-উদ্দীপনায় পোলাও, মুরগি, গরু, বিরিয়ানি, খিচুড়ি, পায়েস, চটপটি, নুডলস ও সেমাই রান্নায় ব্যস্ত থাকতাম। ফজরের নামায পড়ে ঘরের সকলে এক সঙ্গে বসে সেমাই ও পায়েস খেয়ে ঈদের নামাজ পড়তে যেতাম। নামাজ শেষে কেবল খাওয়া আর খাওয়া। যার সঙ্গে যেখানেই দেখা হতো তার বাসায় গিয়ে কিছু না কিছু খেতে হতো।

এখানে খাওয়া তো দূরের কথা, প্রায় সারা দিন উপোস করেই কাটালাম। খাওয়ার জন্য যতোটা কষ্ট পেয়েছি তারচেয়ে হাজারগুণ বেশি কষ্ট পেয়েছি বাঙালি তো পরের কথা, একজন সউদিয়ানের সঙ্গেও কোলাকুলি করতে পারিনি বলে। কারণ এরা মুসলমান ঠিকই কিন্তু এদের সংস্কৃতিতে কোলাকুলির কোনো স্থান নেই।

আরেকটি কষ্ট হলো, পরিবারের কারো সঙ্গে একটা হ্যালো পর্যন্ত বলতে পারিনি। ঘুমানোর জন্য অন্যদিকে কাৎ হলাম আর সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলাম চোখের পানিতে কখন যে বালিশ ভিজে একাকার হয়ে গেছে তা একটুও টের পাইনি।

এখানে এভাবে আরো দুটি ঈদ কাটিয়েছি এবং আরো কতো যে কাটাতে হবে আর আমার মতো আরো কতোজনে যে কাটাচ্ছে তা একমাত্র আল্লাহই বলতে পারে।

তাই দেশি ভাইবোনদের প্রতি আকুল আবেদন আমাদের মতো যারা অভাগা তাদের দুই টাকার বিনিময়ে ঈদের দিন ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অন্তত একটা SMS করবেন।

সউদি আরব থেকে

00966-500785490

বোরখাওয়ালি

– পিনু

কলেজের কাছেই চার বন্ধু একটি মেসে থাকি। নিরিবিলি পরিবেশ। টিনশেড ঘরে দুটি রুমের একটিতে একজন এবং অপরটিতে তিনজন থাকি। আমাদের মেসের কাছেই একটি আবাসিক মহিলা মাদ্রাসা রয়েছে। চারদিক দেয়াল ঘেরা মাদ্রাসার ভেতরেই ছাত্রীরা থাকে। বিকেলে ঘুরতে বের হলে দেখা যায় অনেক মেয়ে বোরখা পরে বাইরে বের হচ্ছে।

দেখে আমার ধারণা জন্মালো, মাদ্রাসার মেয়েগুলো খুবই ভালো। কিছুদিন লক্ষ্য করে বুঝলাম, আজকের এই অশ্লীলতার যুগে সতী-সাধ্বী নারী হয়তো এরাই হবে!

১৯৯৭ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ ভালোবাসা দিবস। আমার বন্ধুরা সবাই কলেজে ক্লাসে গিয়েছে। কিন্তু আমি কিছুটা অসুস্থ থাকায় রুমে শুয়ে রয়েছি। বেলা এগারোটার দিকে আমাদের মেসের মালিকের ছেলে এসে বললো, ছোটভাই! একটু বাইরে যাও তো, আমরা একটু আলাপ করবো।

ভাবলাম কতোক্ষণই বা হবে! তাই অসুস্থতা সত্ত্বেও বাইরে বের হয়ে গেলাম। দেখলাম, বোরখা পরা পাচটি মেয়ে এবং মালিকের ছেলেসহ আরো পাচটি ছেলে ঘরে প্রবেশ করলো।

বাইরে কিছুক্ষণ ঘুরে আধঘণ্টা পর ফিরে এলাম। দরজার কাছে আসতেই যা শুনলাম তাতে আমার আর বুঝতে বাকি রইলো না, ভেতরে কি হচ্ছে। ফিরে এলাম। রাস্তার পাশের কৃষ্ণচূড়া গাছটার নিচে দাড়িয়ে দাড়িয়ে ভাবছি কি করা যায়!

অল্প কিছুক্ষণ পর দেখি মালিকের ছেলে বের হয়ে আসছে। কাছে এসে আমার দিকে কিছু টাকা বাড়িয়ে বললো, যাও ছোটভাই, সিনেমা দেখে এসো।

বললাম, না, আমি সিনেমা দেখি না। তাছাড়া আমি এখন অসুস্থ।

সে বললো, তাহলে কিছুক্ষণ ঘুরে এসো আমরা আরো কিছুক্ষণ আলাপ করবো। এই বলে সে চলে গেল। শুধু হাবলার মতো চেয়ে রইলাম।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো। কিন্তু তাদের মধুর আলাপ আর শেষ হয় না। পাচ জোড়া উন্মত্ত যুবক-যুবতীর ধারাবাহিক আলাপ বিকাল চারটা পর্যন্ত চললো। অতঃপর তারা বের হয়ে এলো। দেখলাম, ছেলেগুলো একদিকে চলে গেল এবং মেয়েগুলো আস্তে আস্তে মাদ্রাসার গেটের ভেতর ঢুকে পড়লো।

এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর মাদ্রাসার ছাত্রীদের সম্পর্কে জন্মানো আমার এতো দিনের ধারণা পাল্টে গেল। ঘুরে ঘুরে আসে ১৪ ফেব্রুয়ারি, ভালোবাসা দিবস আর তখনই আমার সেই বোরখাওয়ালিদের কথা মনে হয়।

কিশোরগঞ্জ থেকে

আমার হবু বৌ

– আহমেদ শিবলী সাদিক কল্লোল

ইদানীং এলাকার এক আপুর সঙ্গে আমার খুব ভাব চলছে। তার সঙ্গে আমার ভাবটা মাঝে মধ্যে ঝাল, মাঝে মধ্যে মিষ্টি আবার কখনো কখনো ভীতিকর। যদিও ওনার সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়। লোকে ভরসা দেয়, বলে, *ভালো ভালো, চালাইয়া যান*।

ভরসা পেলেও তেমন সাহস পাই না। ইদানীং খুব অলস হয়ে গেছি বলে আমার গিন্নির সঙ্গে টাংকি মারার জন্য কলেজে পর্যন্ত যেতে পারি না। আসল কথাই বলা হয়নি।

আপনাদের ভাবি এবার কলেজে উঠেছেন। ম্যাডাম আমার শ্বশুর সাহেবের সঙ্গে কলেজে যান আবার বাসায় একই সঙ্গে ফিরে আসেন বলে সংবাদদাতারা জানিয়েছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : আমার শ্বশুর সাহেব এ কলেজেরই কুখ্যাত প্রফেসর।

আমি এখনো কলেজে আমার ডেঞ্জারাস পত্নীকে দেখতে যাইনি বলে গিন্নি আমার দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এই খবর শোনা মাত্র আমার ইচ্ছা হয়েছিল ফাল দিয়া গাছ থেকে পড়ে কোমর মচকাইয়া ফেলাই। অতিশয় অলস এবং ভীতু বলে কাজটা করা হয়নি। ইশ! আপনাদের শেষের কথা আগে বলে ফেলেছি। থুক্কু! চলেন এবার আগের কথা শোনা যাক।

ছোটবেলা থেকে কোনো খেলাই ভালো খেলতে পারি না। বন্ধুরা কখনোই আমাকে খেলায় নিতো না। তাই নিষ্ঠার সঙ্গে আম্পায়ার বা রেফারির দায়িত্ব পালন করতাম। খুব নিরীহ ছিলাম এবং একদম ঝগড়া করতে পারতাম না বলে সবার সঙ্গেই আমার খুব ভাব ছিল। যতো দূর মনে পড়ে, সিড়ি দিয়ে নামার সময় ইতুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম।

সে আমাকে বললো, *ছাগল*।

চট করে বলে ফেললাম *রাম ছাগল*।

এটাই হচ্ছে আমার সবচেয়ে সার্থক ঝগড়া। বোঝেন অবস্থা।

আমরা থাকতাম ফরিদাবাদের ব্যাংক কলোনিতে। কিছুদিন হলো এইটে উঠেছি। তখন আমাদের বিল্ডিংয়ের তিন তলায় নতুন একটা ফ্যামিলি এলো। তাদের একটা মেয়ে, আরেকটা ছেলে। ছেলেটার নাম অপু, মেয়েটার নাম ঝুমি। নামের কি সাংঘাতিক অমিল!

অপু আমাদের ছোট হলেও আমাদের সঙ্গে খেলতো। ঝুমি খুব লাজুক ছিল বলে তার নাগাল তখনো পাইনি। আমরা নিয়মিত নিচে নেমে খেলাধুলা করি। আগের মতোই দিন কাটতে লাগলো।

আমাদের এক বন্ধু রাজ, ঝুমির প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগলো।

অন্য বন্ধুরা মিলে নানান রকম প্ল্যান করতে লাগলো কিভাবে প্রস্তাবটা দেয়া যায় আর আমার কাছ থেকে খুব সাবধানে ব্যাপারটা লুকানো হলো। আমার পেটে একদমই কথা থাকে না তাই।

এরপরই ঘটলো বিপত্তি।

ভালো খেলোয়াড় রাজু ঘন ঘন আউট হতে লাগলো। তাই নিয়ে সবাই হাসাহাসি করে। অন্য সময় হলে ফাটাফাটি হয়ে যেতো।

বোকা হলেও একদিন ব্যাপারটা নজরে পড়ে গেল। রাজু মশাই ঘন ঘন তিন তলার দিকে তাকায়। যখন ঝুমি বারান্দায় আসে তখনই রাজু নায়ক হয়ে যায়। একটু জোরে কথা বলে, আরো কতো রকম নায়কগিরি।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, বারান্দায় এসে ঝুমি আমাকেই লক্ষ্য করতো। রাজু সেটা জানতো না, এমনকি আমিও। ঝুমির সঙ্গে আমাদের বন্ধুদের মধ্যে সবার আগে আমার কথা হয়।

পুরান ঢাকায় *সাকরাইন* নামে একটা দিন আছে। ওই দিন প্রচুর ঘুড়ি ওড়ানো হয়। হাজার হাজার ঘুড়িতে ঢাকা ছেয়ে যায়। আমরা সবাই ছাদে উঠে ঘুড়ি ওড়াই। আমি ঘুড়ি একটু ওড়ালেই অন্য একটা ঘুড়ি এসে কেটে দিয়ে যায়। তাই ঘুড়ি না উড়িয়ে ওই দিন শার্লক হোমস পড়তে থাকি।

কয়েকটা মেয়ের সঙ্গে ঝুমিও ওই দিন ছাদে উঠেছিল।

মেয়েদের মধ্যে ইতু আমার খুব ভালো বন্ধু। সে আমার কাছে এসে বললো, কিরে ছাগল কি করিস!

বললাম, দেখতে পাচ্ছিস না, রাম ছাগল।

তারপর ইতু যেটা বললো সেটা শুনে লাফ দিয়ে ছাদ থেকে পড়ে যেতে ইচ্ছা করলো। ঝুমি নাকি আমার সঙ্গে প্রেম করতে চায়! একি বিপদজনক কথা। ভাগ্যিস শার্লক হোমস পড়ে আমার মাথায় অনেকখানি কুবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। বললাম, প্রেম যেন কিভাবে করে, ইতু?

আমার মাথায় একটা গুতা দিয়ে ইতু বললো, তুই আসলেই একটা ছাগল। তারপর ইতু আমাকে কিভাবে প্রেম করতে হয় তা শেখাতে লাগলো। প্রথমে হাত ধরতে হবে। তারপর বলতে হবে, আমি তোমাকে জানের চেয়ে বেশি ভালোবাসি, তোমাকে না পেলে বাচবো না ইত্যাদি।

শুনে আমার ভদ্র কান কপাট বন্ধ করে দিল। আমার করুণ চেহারাটা আরো করুণ করে বললাম, ইতু ও আমি মরে গেলেও এসব উল্টাপাল্টা কথা বলতে পারবো না। তুই বরং ঝুমিকে গিয়ে বল, রাজু তার প্রেমে পড়ে গেছে। ঝুমিকে না পেলে রাজু সত্যি মরে–টরে যেতে পারে। রাজু মরে গেলে আমরা খুব ভালো একটা খেলোয়াড় হারাবো।

এ কথা বলাই কাল হলো। ইতু চিৎকার করে রাজুকে ডাকতে লাগলো।

খপ করে ইতুর পায়ে ধরে মরিয়া হয়ে বললাম, মাপ কর ইতু, তোর পায়ে পড়ি।

কে শোনে কার কথা। রাজুকে ডেকে এনে ইতু চোখ পাকিয়ে বললো, এই শালা, তুই নাকি ঝুমিকে ভালোবাসিস? কত্তো সাহস! আরেকদিন ঝুমির দিকে তাকালে তোর চোখ গেলে দেবো।

এই কথা শুনে বেচারা প্রেমিক রাজু যতোটুকু ভয় পেল আমি তার দশগুণ ভয় পেয়ে পেলাম।

কাদো কাদো হয়ে ঝুমিকে বললাম, এই ঝুমি, দেখো ভাই আমি প্রেম ট্রেম করতে পারি না। আমাকে মাপ করে দাও প্লিজ।

ঝুমি এই কথা শুনে রোমান্টিকভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, দিতে পারি এক শর্তে, আমাকে প্রতিদিন শিউলি ফুল এনে দিতে হবে।

ঝুমির কথা শুনে এবার সত্যিই ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম। কি সুইট কণ্ঠ! যেন কথা বলছে না, গান গাইছে।

বললাম, শিউলি ফুল কোথায় পাবো?

সে বললো, জামিলভাইদের বাসার সামনে শিউলি ফুলের গাছ আছে। খুব ভোরে উঠে ফুল কুড়াতে হবে। না হলে অন্য মানুষ ফুল নিয়ে যাবে।

এবার শার্লক হোমস হয়ে গেলাম। বললাম, তুমি শিউলি ফুল দিয়ে কি করবে?

সে বললো, মালা বানাবো।

মালা দিয়ে কি করবে?

তোমাকে দেবো।

এবার আমি ভীষণ অবাক হয়ে জানতে চাইলাম, আমি মালা দিয়ে কি করবো?

তোমার যা মন চায় করবে আর যদি আমাকে ফুল তুলে না দাও এবং মালা না নাও তবে আমার সঙ্গে প্রেম করতে হবে।

আমার কাছে মনে হলো, এই নিরীহ চেহারার মাথা খারাপ মেয়েকে, আমি তোমাকে ছাড়া বাচবো না বলার চেয়ে ফুল এনে দেয়া বা মালা নেয়া অনেক সহজ কাজ। বললাম, আচ্ছা। বলেই বিষম খেলাম।

সকালে উঠতে হবে এ কথা ভেবেই রাতে ভালো ঘুম হলো না। তারপর ভোরে নামাজের কথা বলে ফুল তুলতে গেলাম। শিউলি ফুল চিনি না। ভেবেছিলাম শিউলি ফুল গোলাপ ফুলের মতো হবে। তার ভোর বেলায় জামিলভাইদের বাসার সামনে গিয়ে ফুল গাছ খুজছি। হঠাৎ দেখি জামিলভাইয়ের দাদা একটা গাছের নিচে কি যেন খুজছেন। আমি কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি করেন দাদু?

তিনি বললেন, শিউলি ফুল তুলি।

নিচে তাকিয়ে দেখি হাজার হাজার ছোট ফুল ঘাসের ওপর পড়ে আছে। তিনি অনেকগুলো ফুল তুলেছেন।

বললাম, দাদু, আমি কয়েকটা তুলি?

দাদু বললেন, নিবি কিভাবে, দাড়া তোকে একটা পলিথিন এনে দিই। তুই গাছ ধরে ঝাকি দে।

শিউলি ফুল দেখে মুগ্ধ হয়ে বসে আছি। যখন গাছ ধরে ঝাকি দিলাম তখন আর আমার বিস্ময়ের সীমা–পরিসীমা রইলো না। কি সুন্দর বৃষ্টির মতো ফুল ঝরে পড়ছে।

মনে মনে বললাম, উফ, কি সুন্দর, কি সুন্দর!! ফুল কুড়িয়ে মাঝারি ধরনের পলিথিন ব্যাগ ভরে ফেললাম। ফুল নিয়ে এক রকম নাচতে নাচতে বাসার কাছে এসে উপরে তাকাতেই দেখি ঝুমি দাড়িয়ে আছে। তাকে দেখাচ্ছে একটুরো মেঘের মতো। মনে মনে আবার বললাম, উফ, কি সুন্দর! কি সুন্দর!!

আমাকে ইশারায় দাড়াতে বলে সে একটা সুতা ছাড়লো। ইশারায় বললো, ব্যাগটা বেধে দিতে।

কাজটা করলাম অনেকটা চোরের মতো। ধরা পড়লে যাবজ্জীবন হয়ে যাবে। তারপর বাসায় এসে আবার ঘুম দিলাম।

বিকেলবেলায় ঝুমি আমাদের বাসায় এলো। তার গলার স্বর শুনে দৌড় দিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলাম। মনে মনে পণ করলাম এক ঘণ্টা আগে বের হবো না। যখন সন্ধ্যা হয়ে গেল তখন বের হলাম। বের হয়ে দেখি ঝুমি নেই। ফুলের মালা আর একটা চিরকুট। তাতে লেখা, তোমার খবর আছে।

এটা পড়েই আমার খবর হয়ে গেল।

তারপর... দিন যাচ্ছে...। এই দিনগুলোতে এমন কোনো ক্ষতিকর কাজ নেই যা সে আমাকে দিয়ে করায়নি। ঘোর মেঘলা দিনে বৃষ্টির মধ্যে ছাদে নিয়ে ভিজিয়েছে। বৃষ্টিতে ভিজে নিউমোনিয়ার মতো হয়ে গেল। স্কুল পালিয়ে বুড়িগঙ্গা বৃজে নিয়ে ঘুরিয়েছে। বুড়িগঙ্গা নদীতে নৌকা ভাড়া করে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছে। একে আমি ভীতুর ডিম তার উপর সাতার পারি না। ভয়ে আমার জান বের হয় হয় অবস্থা।

শেষে এই অত্যাচার থেকে বাচার জন্য ইতুর শেখানো কথাগুলো বলে ফেললাম।

ঝুমি, তোমাকে আমি জানের চেয়ে বেশি ভালোবাসি, তোমাকে ছাড়া আমি বাচবো না। এবার প্রেম হয়ে গেছে, এবার আমাকে মাপ করো। প্লি-ই-জ!

এই কথা শুনে ঝুমি মিটি মিটি হাসলো, তারপর বললো, আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দিই, তাই না?

সঙ্গে সঙ্গেই বললাম, জি ভীষণ। কথাটা বললাম ঝোকের মাথায়।

তারপর ঝুমি আর আমার সঙ্গে কথা বলে না, ঘোরে না, যখন-তখন বাসায় এসে ভয় দেখায় না।

আমি জানে বেচে গেলাম। মনের মতো করে বসে বসে সময় কাটাতে লাগলাম। কয়েকদিন যাবার পর একা বোরিং হতে থাকলাম। কোনো উত্তেজনা নেই।

সামনে এসএসসি পরীক্ষা। তাই পড়া নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কে রাখে ঝুমির খবর? সে তখন নাইনে পড়ে।

দেখতে দেখতে আমার এসএসসি পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। আমার এলো অনেক ছুটি। মাঝে মধ্যে নিচে বা ছাদে গিয়ে ইতুর সঙ্গে আড্ডা দিই। হঠাৎ একদিন অবাক হয়ে আবিষ্কার করি, ঝুমি সারাক্ষণ রাজুর পিছে ঘুরঘুর করে। একবারও আমার সঙ্গে কথা বলে না। চোখে চোখ পড়লে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

আমার অজান্তেই ঝুমির ওপর আমার একটা অধিকার বোধ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তাই যখন সে আর আমাকে উপদ্রব না করে রাজুর সঙ্গে প্রেম প্রেম ভাব করে তখন আমার হিংসায় মরে যেতে ইচ্ছা করলো।

তারপর রাগের মাথায় তিন মাস মামার বাড়িতে গিয়ে বসে রইলাম। কলেজে ভর্তি হয়ে সকাল সন্ধ্যা বাইরে রইলাম। অভিমান করে সব সময় চাইতাম, ভুলেও যেন ঝুমির সঙ্গে আমার দেখা না হয়।

বেশ কিছুদিন হলো তিনি কলেজে যাচ্ছেন। রাজু এসে একদিন বললো কি রে, তুই ঝুমির সঙ্গে কথা বলিস না কেন?

আমার করুণ মুখটা উদাস করে বললাম, কি বলবো?

রাজু হাসতে লাগলো।

ধমক দিয়ে বললাম, কি রে হাসছিস কেন?

এবার রাজু সিরিয়াস হয়ে বললো, তোর কি ধারণা, ঝুমির সঙ্গে আমার প্রেম? সারা দিন তোর কথা বলে বলে কান খেয়ে ফেলেছে। তোরা কবে কোথায় গিয়েছিস, কোন দোকানে গিয়ে চা খেয়েছিস, কবে বৃষ্টিতে ভিজেছিস, নৌকায় উঠে তোর চেহারা কেমন হতো, আরো কতো কি। তুই নাকি তাকে অপমান করেছিস? দুঃখে সে কয়েকদিন ভাতই খায়নি।

আমার অজান্তেই আমার চোখ জ্বালা করে পানি চলে এলো।

রাজু ভ্যাবাচেকা খেয়ে বললো, কি রে, কাদছিস কেন?

খুব বিব্রত বোধ করতে লাগলাম।

তারপর রাজু আবার বলতে লাগলো, ঝুমি তোকে কলেজে গিয়ে দেখা করতে বলেছে। ঝুমি তার বান্ধবীদের কাছে বলেছে, তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। তুই নাকি ওর হবু বর। তাই তার বান্ধবীরা তোকে দেখতে চায়।

হায়! কি মাথা খারাপের মতো কথা।

ভাইসব, আপনাদের কাছে নালিশ করি, এমন কোনো অকাজের কাজ নেই যা সে আমার সঙ্গে করেনি। এখন বলছে, আমি নাকি তার হবু বর!! এ রকম মাথা খারাপ মেয়ের সঙ্গে আমার মতো ভীতু ছেলেকে কি মানায়?

এখন আমি কি করি?

বারহাট্টা, নেত্রকোনা থেকে

চায়নিজে একদিন

– নাজমুন নাগীব ধ্রুব

আমি তখন ক্লাস ফোরের ছাত্র। রমজানের ঈদের আগে আমরা তিন বন্ধু নাফিস, তানভীর ও আমি ঠিক করলাম এবার ঈদে আমাদের জমানো টাকা দিয়ে কিছু মজা করবো।

নাফিস বললো, চাইনিজ খেলে কেমন হয়?

তানভীরও রাজি।

তাতে সায় দিয়ে বললাম, ঠিক আছে। তবে তা ঈদের দুই চার দিন পরে ছাড়া সম্ভব হবে না। কেননা ঈদের দিন বাসায় অনেক অতিথি আসবে।

তানভীর ও নাফিসকে ঈদের দিন বাসায় আসতে অনুরোধ করলাম।

ঈদের দিন নামাজ শেষে আমরা যে যার বাসায় গিয়ে মাটির ব্যাংক ভাঙলাম। সারা দিনে ঈদের সালাম বাবদ সবার ভাগেই কিছু সালামিও জুটলো।

বিকেলে তানভীর ও নাফিস আমাদের বাসায় এলো। জানা গেল, তিনজনের সর্বমোট টাকা জমেছে দুই হাজার একশ আটান্ন টাকা।

মনে খুশি খুশি লাগছে। বয়সের তুলনায় পরিকল্পনাটা একটু পাকামো মনে হচ্ছে।

দিন তিনেক পর তিন বন্ধু কাউকে না জানিয়ে বিকেলে বাসা থেকে বের হয়ে এলাম। আমাদের বাসা থেকে চায়নিজ রেস্টুরেন্ট বেশি দূরে নয়।

আমরা হাটতে হাটতে পুরানা পল্টন মোড়ে গিয়ে দেখি তিনটি গরিব ছেলে ভিক্ষে করছে। ওদের মাথার চুল উষ্কখুষ্ক। ওদের ভাগ্যে কোনো খাবার জুটেছে কি না সন্দেহ।

নাফিস বললো, চল, আমরা ওদের নিয়ে রেস্টুরেন্টে যাই।

বললাম, ঠিক আছে।

নাফিস বললো, টাকায় কুলাবে তো?

তারপর তানভীর ছেলেগুলোকে বললো, তোমরা চায়নিজ খাবে?

ওরা বললো, হ *খামু*।

একজন বললো, আমাদের কাছে কোনো টাকা পয়সা নেই।

বললাম, তোমরা ভেবো না, টাকা আমাদের কাছে আছে।

আমরা রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসলাম। তারপর খাবারের অর্ডার দিলাম। ওয়েটার এদিক–ওদিক তাকালো। তারপর জিজ্ঞাসা কররো, ওরাও খাবে?

উত্তর দিলাম হ্যা।

ওয়েটার খাবার নিয়ে এলো।

রাস্তার ছেলেরা খাবার টেবিলে কাটা চামচ ও ছুরির ব্যবহার জানে না। ওরা এসব খাবার হাত দিয়ে তুলে খেতে লাগলো।

ওদের খাওয়া দেখে আমরা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লাম।

ওরাও হাসতে লাগলো। সুপ ওদের কাছে ভালো লাগেনি। তবে ওরা রাইস ও চিকেন ফ্রাই খুব মজা করে খাচ্ছিল।

আমার মনে হলো ওরা বহুদিন পর সত্যি ঈদের আনন্দ অনুভব করলো।
পেট পুরে খেলো।
আমরাও পুলকিত হলাম।
মনে হলো এবারের ঈদটা আমাদের সার্থক হলো।
যদিও বা পরে মায়ের কাছে সাহসীপনার জন্য বকুনি খেয়েছিলাম।
বাবা সব শুনে বলেছিলেন, *এই না হলে বাপকা ব্যাটা*!

সেগুন বাগিচা, ঢাকা থেকে

রাজাজি ন্যাশনাল পার্কে

– নাহার সিদ্দিকী

বৃষ্টির অকস্মাৎ আগমনে গতকাল আমাদের নির্ধারিত ভ্রমণটি বাদ দিতে হয়েছিল। আমরা রাজাজি ন্যাশনাল পার্কে যাচ্ছিলাম। বৃষ্টি এলে কোনো জীব-জানোয়ারই তাদের ডেরা থেকে বের হবে না। ভূনা খিচুরি আর বেগুন ভাজা না খেলেও উষ্ণ ডেরাটিই হবে তাদের অপেক্ষাকৃত প্রিয় জায়গা। তাছাড়া আজ ঘুরতে ঘুরতে দেখছি কিছুক্ষণ পর পরই চোখে পড়ছে পানির ক্ষীণ স্রোতধারা বয়ে চলেছে। বৃষ্টির পানি বেশি হলে এসব জলধারা স্ফীত হয়ে উঠতে পারে যা চলাচলের জন্য প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাড়াবে।
আমাদের সঙ্গে আছেন এলাহাবাদ ট্রিপল টিআই-এর কনসালটেন্ট প্রফেসর রাধাকৃষ্ণ ও তার স্ত্রী রাধা। তাছাড়া তাদের বেয়াই ও বেয়াইন শ্রী বিদ্যাপতি দম্পতি। বনের ভেতর ঢোকার আগেই প্রফেসর রাধাকৃষ্ণ সতর্ক করে দিয়েছেন জন্তু-জানোয়ার দেখলে যেন আমরা কোনো শব্দ না করি। ইঙ্গিতেই যেন আমরা জীবজন্তু দেখানোর কাজটা সারি।
হঠাৎ রাস্তার দিকে আঙুল দেখালেন আমার স্বামী মি. সিদ্দিকী, হাতির টাটকা পূরীষের স্তুপ দেখা যাচ্ছে।
জঙ্গল অভিজ্ঞ প্রফেসর জানালেন আশপাশেই দেখা যাবে বন্য হাতি।
সত্যিই তাই। সামনেই দেখি বিপুলাকায় হাতি দাড়িয়ে। আমাদের গাড়ি গেল থেমে। কিন্তু প্রফেসর রাধাকৃষ্ণ গাড়ির চালককে বললেন পাশ কাটিয়ে তাড়াতাড়ি সামনের দিকে চলে যেতে। পরে বললেন, হাতিটা বন্য, সুতরাং তার গতিবিধি বলা মুশকিল। হঠাৎ ক্ষেপে আমাদের তাড়া করতেও পারে। সামনে যেহেতু উৎরাই সে জন্য দ্রুত চলাও মুশকিল। তাই এই সাবধানতা।
আমরা হরিদ্বার থেকে মাত্র আট নয় কিলোমিটার দূরের রাজাজি অভয়ারণ্যে এসেছি। সময়টা বেছে নিয়েছি খুব ভোরে। এই সময়ে পশুপাখিরা বনে ঘুরে বেড়ায়। মতিচুর স্যাংচুয়ারি, রাজাজি স্যাংচুয়ারি আর চিল্লা স্যাংচুয়ারি মিলে গড়ে উঠেছে রাজাজি জাতীয় অরণ্য। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজা গোপালচারীর নামেই এ পার্কের নামকরণ হয়েছে। তিনটি মিলে এই পার্কের আয়তন এখন বিরাশি হাজার হেক্টর জমি। করবেট ন্যাশনাল পার্কের প্রায় দ্বিগুণ জমি নিয়ে এই পার্কটি গঠিত। সুবিখ্যাত বাঘ শিকারি জিম করবেটের নামে যে পার্কটি খ্যাত সেটি একশ আশি কিলোমিটার দূরে এবং এই বনের সঙ্গে সেটি মিলেছে।
হরিদ্বারের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে বয়ে চলেছে গঙ্গা। তার অবাধ্য জলরাশির ওপর ভিমগোড়া বাধ, পাশেই হরকি গৌড়ির বিখ্যাত টাওয়ার। তার পাশের রাস্তা ধরে এগুলে দেখা যাবে জঙ্গলের গাছপালা মাথা উচু করে দাড়িয়ে। ক্রমেই তা ঘন হয়ে উঠেছে। এই অভয়ারণ্যে ঢোকার জন্য রয়েছে অনেকগুলো গেট। আমরা ছয় নাম্বার গেট দিয়ে ঢুকেছি। সবশুদ্ধ সাতটা গেট রয়েছে। গেটে এন্ট্রি ফি এবং ক্যামেরা ফি জমা দিয়ে নাম-ধাম লেখাতে হয়। দেরাদুনের শিবালিক পর্বতের পাদদেশে এই অভয়ারণ্য, আবার গঙ্গার সমতল ভূমিও অদূরে অবস্থিত। সে জন্য উদ্ভিদের সংখ্যাও অনেক বেশি। পাহাড়ের পাইন প্রজাতির গাছও যেমন দেখা যায় তেমনি দেখা যায় পলি মাটি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে বেড়ে ওঠা বড় বড় পাতা বিশিষ্ট বৃক্ষরাজিমালা।

ভেতরে রয়েছে আকর্ষণীয় বনবাংলো। ভেতরে ঢুকে আমরা যে রাস্তায় ঘুরলাম, কোনো লোকজন দেখলাম না। গেটের প্রবেশদ্বারে একজন বন্দুকধারী গাইডের খোজ নেয়া হলো। কিন্তু পাওয়া গেল না। তাই দুরূহ বিপদসঙ্কুল পথ পরিহার করতে হলো। আমাদের গাড়ির চালকও একজন গাইড বটে। তার ওপর ভরসা করে পথ চলা শুরু হলো।

সাপের মতো একেবেকে ছায়াময় সুদীর্ঘ পথ। গাড়ি একবার মন্থর গতিতে চড়াইয়ের ওপর উঠছে আবার দ্রুত গতিতে ঢালু রাস্তায় নেমে যাচ্ছে। আমাদের গাড়ি ছাড়া কোনো গাড়ি চোখে পড়লো না। রাস্তার দুই ধারের অরণ্যে শাল, সেগুন আর নানা ধরনের বুনো ফলফুলের গাছ। জায়গায় জায়গায় ঝোপ। হঠাৎ দেখি একদল হরিণ। দুই তিনটা আমাদের গাড়ির পাশেই এসেই আবার চকিত চরণে মিলিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর পরই হরিণের দেখা পাচ্ছিলাম।

কয়েকটা বুনো শুয়োর আশপাশে দৌড়াচ্ছে। ময়ূরও দেখা গেল। ঝাক বেধে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘাসের বনে তাদের অবাধ বিচরণ।

কিছুক্ষণের মধ্যে একটা নীলগাইও যখন দেখে ফেললাম তখন মনে মনে প্রফেসর রাধাকৃষ্ণকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারলাম না।

চোখ খুজে বেড়াচ্ছিল আরো কিছু। যদি বাঘের দেখা মেলে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মতো করে চোখের ব্যবহার করেও বাঘের দেখা মিললো না।

শম্বর হরিণ এবং নীল সবুজের ফুচকি দেয়া বস্ত্র পরিধানকারী ময়ূর আমাদের প্রায় সারা পথই সঙ্গ দিতে থাকলো। এ দুটি প্রাণীর সংখ্যা অনেক। অরণ্যের ভেতরের রাস্তা মাঝে মাঝে এক হাজার ফিট পর্যন্ত উচ্চতায় উঠেছে। সমস্ত পথই চড়াই এবং উৎরাই। সাপও আছে এই জঙ্গলে, পাইথন এবং কিং কোবরা।

অরণ্যটির চার ভাগের তিন ভাগই পাহাড়ি আর ভেতর দিয়ে বয়ে গিয়েছে গঙ্গা নদীর মৃদুমন্দ স্রোত। তাছাড়া অজস্র জলধারা বয়ে চলেছে অনবরত। অজস্র নুড়িকণা সেই জলের ভেতর। গাড়ি পার হয় সেই জলধারার ওপর দিয়ে। পানি খুব সামান্যই বয়ে যাচ্ছিল। আমার কাছে সে এক বিচিত্র অনুভূতি। সব কিছু ছেড়ে মনে হচ্ছিল গাড়ি থেকে নেমে পানির ওপর হেটে চলি। কিন্তু বনের মাঝে আমাকে নামতে দেয়া হবে না। গাড়ির চালক কয়েকবার নেমেছে কাজে বা অকাজেও।

এ জলধারাগুলোর মাঝে নানান রকম মাছও রয়েছে। ট্রাউট, কালবাউশ ও মহাশোল মাছও পানিতে রয়েছে। অরণ্য জুড়ে তিনশ পনেরো ধরনের উদ্ভিদ। এবং আছে একশ পনেরো ধরনের প্রজাতির পাখি।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, এই চিল্লা অরণ্যের গভীরে বসবাস করছে একদল মানুষ। তারা রাজস্থান অঞ্চলের গুর্জর সম্প্রদায়ের লোক। বন দফতর তাদের তাড়াতে চাইলেও তারা নাছোড়বান্দা হয়ে এখানে শেকড় গজিয়ে আস্তানা গেড়েছে।

ফেরার সময় হয়ে এলো। হালকা বৃষ্টি হচ্ছিল। আবার ফিরে চলা হরিদ্বার হয়ে হৃষিকেশ।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

সিম সিসটেমে

– মোহাম্মদ সজিব উল্লাহ সাজু

শুনেছি অতীতে নাকি প্রেম হতো সিটিসেলের মতো। যে যাকে ভালোবাসতো তাকেই বিয়ে করতো। সারা জীবন তারা সিটিসেলের সংযোগ তার সেটের মতো একে অপরকে জড়িয়ে রাখতো।

বর্তমানের প্রেম চলছে গ্রামীণ, একটেল, বাংলালিংক, টেলিটক-এর মতো। যে কেউ চাইলে যে কোনো সময়ই তার সিমরূপী প্রেম বদলাতে পারে। যখন যে ভালো সুবিধা দিতে পারবে তখন তারা অর্থাৎ আজকের প্রেমিক-প্রেমিকারা তাকেই গ্রহণ করবে। তবে আজকাল তো একই সেটে একাধিক সিম ব্যবহার করা যায়।

তাই এখন একাধিক প্রেম করাটা যেন ফ্যাশন হয়ে দাড়িয়েছে। সকালে একজন, দুপুরে একজন, বিকেলে একজন – এভাবে সারা দিন সবাই ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে।

এতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এদের পড়াশোনা। বাড়ি থেকে সকালে ঠিকই সবাই বের হয়। কিন্তু কাজের কাজ হয় কি না তা কে জানে। তবে যাই বলুন, বর্তমানে প্রেম যেহেতু সিম সিসটেমে চলে গেছে, ভবিষ্যতে আর কি যে নতুনত্ব আসবে তা নিয়েই এখন ভাবতে হচ্ছে।

শেষে এটুকু বলতে হয়, বর্তমানে যেভাবে নাটক, সিনেমাতে একজনের স্বামী বা স্ত্রীকে আরেকজন টানাটানি করছে, সেক্ষেত্রে একজনের প্রেমিক-প্রেমিকাকে অন্যজন টানবে না এটা অস্বাভাবিক। তবে এ অবস্থা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে প্রেম নামের এই স্বর্গীয় জিনিসটি হয়তো মানুষের কাছে নিকৃষ্ট বিষয় হয়ে দাড়াবে।

নারায়ণগঞ্জ থেকে

অচেনা

– গালিব

কুমিল্লা যাওয়ার জন্য বাসস্ট্যান্ডে দাড়িয়ে আছি। ফরিদপুর থেকে কুমিল্লার পথে সরাসরি কোনো বাস নেই। খুলনা থেকে একটি বাস শহরের ওপর দিয়ে যাবে। ওই বাসে দুই তিনটি সিট রাখা হয় কুমিল্লার যাত্রীদের জন্য। আমি ওই সিটের আশায় টিকেট কেটে কাউন্টারে বসে আছি।

এ সময় একজন মহিলা বাচ্চা কোলে নিয়ে কাউন্টারে এসে কুমিল্লা যাওয়ার জন্য একটি টিকেট কিনলে আমার মনোযোগ তার দিকে গেল। মহিলার রূপের চেয়ে তার পোশাকই আমাকে তার প্রতি মনোযোগী হতে বাধ্য করলো। কারণ সে কুমিল্লা যাচ্ছে, অথচ পরনে একটি মাত্র মলিন শাড়ি আর বাচ্চাটা যার বয়স খুব সম্ভবত পাচ থেকে ছয় মাস হবে সে একটি টাওয়েল দিয়ে জড়ানো ছিল। টিকেট কেটে সে আমার পাশেই বসে পড়লো বাসের অপেক্ষায়। তার হাতে কোনো ব্যাগ ছিল না। টাকাগুলো ছিল এক হাতের মধ্যে মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায়।

একটু পর পর সে কাউন্টারে বসা লোকটির কাছে জানতে চাইছিল বাসটি কখন আসবে। এক সময় সে আমাকে ভাই বলে সম্বোধন করলো এবং আমার গন্তব্য জানতে চাইলো। আমার গন্তব্যে আর তার গন্তব্য এক শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে একটু আনন্দিত হলো।

জিজ্ঞাসা করলাম, কুমিল্লার কোথায় যাবেন?

সে যে স্থানটির নাম বললো সে স্থানটির নাম আমি আগে কখনো শুনেছি বলে মনে করতে পারলাম না।

একটু পর বাস এলে আমরা দুজনে বাসে উঠলাম। দুজনের সিট পাশাপাশি।

আমার সিট জানালার কাছে হওয়ায় সে অনুরোধ করলো আমার সিটটা তাকে দিতে।

আমরা সিট বদলিয়ে বসলাম।

বাস চলতে শুরু করলো।

ধীরে ধীরে তার পরিচয় জানার চেষ্টা করতে থাকলাম।

সে আমার সব প্রশ্নেরই জবাব খুব অল্প কথায় এবং দায়সারাভাবে দিচ্ছিল।

যেমন জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাচ্ছেন, স্বামী কি করে?

সে বললো, মামাবাড়ি যাচ্ছি। স্বামী ব্যবসা করে।

তার বলার ভঙ্গিতে কোনো মতেই মনে হচ্ছিল না, সে মামার বাড়ি যাচ্ছে অথবা তার স্বামী মুদি ব্যবসা করে। আমার মনে হচ্ছিল সে বাড়ি থেকে ঝগড়া করে চলে এসেছে। তবে তার সম্পর্কে খুব একটা আগ্রহ প্রকাশ করতে পারছিলাম না তার নির্লিপ্ত ভঙ্গির কারণে। মাঝে মধ্যে সে তার বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে। অধিকাংশ সময়ই সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল।

আমিও এক সময় তার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলার ভান করে সে দিনকার দৈনিকে মনোনিবেশের চেষ্টা করি।

আমাদের বাস কুমিল্লার প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে। আর আধঘণ্টার পথ। বাস রাস্তার পাশে অপেক্ষাকৃত ছোট স্টপজে দাড়িয়ে ছাদ থেকে মাল নামাচ্ছে।

মহিলাটি আমাকে বললো, ভাই, এখানে কি বাস একটু দাড়াবে?

বললাম, মাল নামাতে যতোটুকু সময় লাগে ততোক্ষণ দাড়াবে। সে বেশ সংকোচের সঙ্গে বললো, আপনি কি আমার মেয়েটাকে একটু কোলে নেবেন। আমি একটু নিচ থেকে আসছি।

ভাবলাম সে হয়তো কোনো ব্যক্তিগত কাজে যাচ্ছে। তাই বাচ্চাটিকে কোলে নিলাম।

সে দরজার কাছে গিয়ে একবার আমার দিকে তাকালো। তারপর নেমে গেল।

আমি বাচ্চাটির প্রতি মনোযোগ দিলাম। হঠাৎ হর্নের শব্দে সতর্ক হলাম। বাস যে ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু মহিলাটি তো এখনো বাসে ওঠেনি। চিৎকার করে ড্রাইভারকে বাস থামাতে বললাম। হেলপার সুপারভাইজারসহ আমি বাচ্চা কোলে করে সমস্ত জায়গাটা প্রায় চষে ফেললাম। কিন্তু মহিলাটির দেখা পেলাম না। সুপারভাইজার বললেন, তারা আর বাস থামিয়ে রাখতে পারবেন না। হয় আমাকে তাদের সঙ্গে যেতে হবে। না হলে এখানে থাকতে হবে।

সিদ্ধান্ত নিলাম এখানেই অপেক্ষা করার।

প্রায় এক ঘণ্টা বাচ্চা কোলে নিয়ে সেখানে দাড়িয়ে থাকার পর বুঝতে পারলাম মহিলাটি বাচ্চা ফেলে পালিয়েছে।

অন্য একটি বাসে করে কুমিল্লায় খালার বাড়িতে উপস্থিত হলাম। বাচ্চাটি ততোক্ষণে ক্ষিধেয় কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। খালাকে সংক্ষেপে সব কথা বলে বাচ্চাটিকে খাওয়ানোর কথা বললাম। এতো ছোট বাচ্চা দুধ ছাড়া কিছুই খায় না।

খালা অনেক কষ্টে বাচ্চাটিকে গরুর দুধ খাওয়ালেন। এরপর খালা আমাকে বকতে শুরু করলেন। খালা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছিলেন না, আমি মহিলাটিকে চিনি না।

খালু এসে আমার পক্ষ নিলে খালার হাত থেকে রক্ষা পাই।

পরের দিন খালুর সঙ্গে আবার ওই বাস স্টপজে যাই, মহিলার কথা স্থানীয় লোকজনকে জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু কেউ কিছুই বলতে পারে না।

অবশেষে স্থানীয় থানায় একটি ডায়েরি করে আমরা বাসায় ফিরে আসি এবং বাচ্চাটিকে স্থানীয় একটি এতিমখানায় দিয়ে দিই।

এই ঘটনা আজ থেকে পাচ বছর আগের। এখন পর্যন্ত সেই বাচ্চাটির মায়ের কোনো খোজ পাইনি।

খালার বাসায় গেলে বাচ্চাটিকে দেখতে যাই। সে আমাকে মামা বলে ডাকে।

প্রতিদিন রাস্তায় বের হলেই তার মায়ের মুখটি খুজি। তাকে পেলে শুধু একটি প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করবো, কি কারণে সে এমন করেছিল? আমার বিশ্বাস তাকে একদিন খুজে পাবোই।

ফরিদপুর থেকে